নবী নন্দিনী

হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবনী

BELAL

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য ধর্মীয় বই

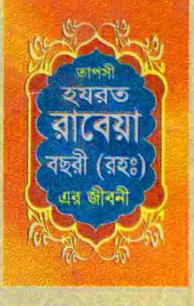

আফতাব ব্রাদার্স

২/৩, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০
৩৬, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭২৪১০ মোবা : ০১৭২১৬৬৯৪০

BELAL

39, 40, 41,42

PAGES ARE MISSING

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা নির্মুল হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।-(বাকারা-১৯৩)

নবী নন্দিনী
হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)
-এর জীবনী

বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পর্ন মোফাচ্ছেরে কুরআন বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা বিশিষ্ট ইসলামিক গ্রন্থ লেখক বহু ওয়াজ ও গজল-এর ক্যাসেটের প্রণেতা আন্তর্জাতিক পত্রিকার ইসলামিক সম্মানিত লেখক।

ছাহেব জাদা হযরাতুল আল্লামা মাওলানা খান

মোহাম্মদ এম.এ. সাইফুল ইসলাম

(যুক্তিবাদী চাঁদপুরী)

সাবেক প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক চাঁদপুর মতলব ইন্টারন্যাশনাল ও মহিলা হেফজুল কুরআন মাদ্রাসা ও এতিমখানা।

মোবাইল ঃ ০১৭২-২৬৪২৯৪

পরিবেশনায়

আফতাব ব্রাদার্স

২/৩, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৩৬, বাংলাবাজার, (২য় তলা) বই বিচিত্রা মার্কেট ঢাকা-১১০০।

ফোন ঃ ৭১৭২৪১০ মোবা ঃ ০১৭২-১৬৬৯৪০

প্রকাশক ঃ
আফতাব ব্রাদার্স
২/৩, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।
৩৬, বাংলাবাজার (২য় তলা)
বই বিচিত্রা মার্কেট, ঢাকা-১১০০।

স্বত্ব ঃ প্রকাশক

বর্ণবিন্যাস ঃ
তাজ গ্রাফিক্স এম.এ.সাইফুর রহমান
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ ঃ আবদুল খালেক
মোবাঃ ০১৭৬-৫৮৮৯৯১

মুদ্রণে ঃ
আফতাব প্রেস
৩৯/১, নন্দলাল দত্ত লেন,
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ঃ নিউজ ঃ ৭৫.০০ টাকা মাত্র।
সাদা ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান

বাংলাদেশের সর্বত্র বইয়ের দোকান সমূহে

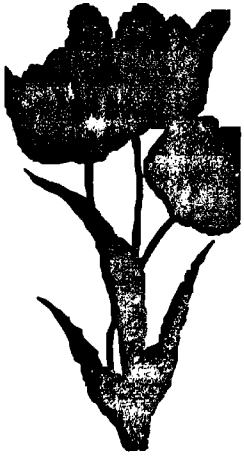

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মাকে উক্ত কিতাবের মাধ্যমে আমি প্রভুর নিকট উনাদের সুদীর্ঘ সুস্থ হায়াত কামনা করছি।

আমীন

শুভেচ্ছা স্বরূপ

হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবনী

গ্রন্থ খানি উপহার দিলাম

নাম ঃ

পিতা/স্বামী ঃ

গ্রাম/মহল্লা ঃ

ডাকঘর ঃ

থানা ঃ

জেলা ঃ

যার পক্ষ হইতে এই উপহার দেওয়া হইল ঃ

নাম ঃ

পিতা/স্বামী ঃ

গ্রাম/মহল্লা ঃ

ডাকঘর ঃ

থানা ঃ

জেলা ঃ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাসূলে পাক (সঃ)-এর নয়নের মনি কলিজার টুকরা	
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পরিচিতি	১৩
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জন্ম	১৯
বেহেশত বাসিনী নারীদের সর্দার	২০
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শৈশব জীবন	২৫
বাল্যকাল হতে তিনি সত্যের পূজারী	২৫
হযরত ফাতেমা (রাঃ) মাতা-পিতার খেদমত যেভাবে করতেন	৩২
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাতার ইন্তেকাল	৩৩
হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাতৃস্থানে ফাতেমা (রাঃ)	৩৫
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শিক্ষা লাভ	৩৮
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মদীনায় হিজরত	৪১
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামীর নাম ও বংশ পরিচয়	৪২
হযরত আলী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	৪৪
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বিবাহের প্রস্তাব	৪৫
হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে শুভ বিবাহ	৪৭
স্বামীর ঘরে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কর্ম ব্যস্ততা	৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহের সময় ও বয়স	৪৯
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামীর গৃহে যাত্রা	৫০
হযরত ফাতেমা (রাঃ) স্বামীর বাড়িতে উঠলেন	৫৩
প্রিয়তমার স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাঃ)	৫৬
কষ্ট ও সহিষ্ণুতার মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ)	৫৮
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামীর গৃহের অবস্থা	৫৯
দু'জনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক	৬১
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক	৬৭
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সত্য ভাষণ	৬৭
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নিরহংকারিতা ও নম্রতা	৬৮
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামীর সেবা	৬৯
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কষ্ট ও ত্যাগ	৬৯
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর লজ্জা-সম্ভ্রম	৭০
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর দানশীলতা	৭৩
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মায়া-মমতা	৭৫
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ইবাদত বন্দেগীর নমুনা	৭৭
আল্লাহর দয়ায় হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিপদ মুক্তি	৮৯
জিহাদের ময়দানে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ভূমিকা	৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর অন্যরূপ	৯৪
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মিল	৯৫
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মর্যাদা	৯৬
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৯৮
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত ফাতেমা (রাঃ)	১০৩
হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)-প্রায়ই ওয়াজ করতেন	
পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আল্লাহ	
নিজেই সন্তুষ্ট হন	১০৬
আল্লাহর নিকট হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মর্যাদা	১৩৯
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বংশের সংরক্ষণ	১৪২
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পোশাক পরিচ্ছেদের নমুনা	১৪৩
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহের মোহরানা	১৪৩
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আদত ও আখলাক	১৪৪
স্বামীর সংসারে ফাতেমা (রাঃ) কাজ কর্ম করতেন	১৫০
হযরত আলী (রাঃ) কে উপদেশ দান	১৫২
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ইন্তেকাল	১৫৩

নাম: হামিরুন বেগম

৫ম: শ্রেণী

রোলনং: ২১

সাল: ২০০৮ ইং

তারিখ ২৮/০৭/০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

রাসূলে পাক (সঃ)-এর নয়নের মনি কলিজার টুকরা হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)-এর পরিচিতি

আজকের কথা নয় প্রায় চৌদ্দশ বছর আগের কথা যখন আরব জাহান নানাবিধ পাপচারে নিমজ্জিত হয়ে অমানবিক কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকত, অকাজে কুকাজে মানুষগুলোর মন মরমর হয়েছে। শুধু তাঁই নয় ক্ষুধারত বাঘের মত, লোলপ নয়নে চেয়ে একজন অন্যজনের রক্তপানে সুবাধে প্রহর গুনছে, এমন দেশের এমন মানুষের মনে কি করে প্রেমের বান সৃষ্টি করা যায়, কেমন করে সমাব সহানুভূতির ফুল ফুটানো যায়। কে-না জানে পরশ পাথর লৌহে করে হেম? বিশ্বাসে অমলে পুড়ে স্বর্ণ হল খাঁটি? তার সরবে আজও ধন্য আরব দেশের মাটি।" যারা হিংস্র পশুকে বশ করতে পারে, তাদের অদ্ভুত ক্ষমতা ও দক্ষতা দেখে অজান্তে আমরা তাদের বাহবা দেই, আর যারা হিংস্র মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে সাধু মহৎ করে তোলেন, সত্যি তাদের মহতী শক্তিতে বিমোহিত হয়ে আমরা জগৎ বরেণ্য মহামানব ভেবে মাথায় তুলেন না। আমাদের হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন, একজন অসাধারণ মানুষ। এমন ভাবনায় হযরতের পবিত্র মুখ হয়েছে বুকের মধ্যের শিরা উপশিরাগুলো থরথর করে কাঁপছে ঠিক এমনি মুহূর্তে এক শুভক্ষণে পবিত্র মক্কার প্রসিদ্ধ ধনবতী মহিলা বিবি খাদিজার বাড়িতে তার ডাক পড়ল। নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা সুপারিশীর কাণ্ডারী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিবি খাদিজার সাথে দেখা করতে গেলে তিনি তার কারবারের অধিনায়ক হয়ে তাকে সিরিয়ায় বাণিজ্যে যেতে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বয়স তখন কেবল চব্বিশ পার হয়ে পঁচিশে পা দিয়েছে। তার সাংসারিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল যা লিখনির মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না। জন্মের পূর্বে পিতা সিরিয়া দেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে ফেরার পথে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। জন্মের পর দাই হালিমা পাঁচ বছর তাকে মায়ের আদর সোহাগ দিয়েমায়ের মত বুকে ধরে রাখেন। অতীব দুঃখের বিষয় হল, ছয় বছর বয়সেমা আমেনাকে এবং আট বছর দুইমাস দশদিন পরে প্রিয় দাদা

আবদুল মুত্তালিব তাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তারপর চাচা আবু তালিবের সাথে দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে তার জীবনের সুদীর্ঘ দিন চলে যায়। পিতা-মাতা রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে হতে তেমন কিছু পায়নি। পাবার মধ্যে পেয়েছিলেন শুধু পাঁচটি উট আর কয়েকটি ছাগল। যার কারণেই পিতা-মাতার যেতে হত। চাচা আবু তালেব ছিলেন বাড়ির কর্তা। যার কারণে প্রয়োজনবোধে অনেক সময় তার সংসারের কাজে সহায়তা করতে হত। তবে এতেও তাদের চাহিদা মত অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ঘুচেনি। আর ঘুচার কথাওনা, যেহেতু আবু তালিবের সংসার ছিল খুবই বড় এছাড়া আয়ের চেয়ে ব্যয় ছিল অনেক বেশী। বিধায় কষ্ট ক্লেশের মধ্যে দিয়ে তাদের দিন কাটাতে হত। তারা শুকনো রুটি আর সামান্য কয়েকটি খেজুর পেলে অনেক খুশি হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। তবে একথা নিশ্চিত সত্য যে আর্থিক অবস্থা যত খারাপ হোক না কেন চরিত্র সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ নিশ্চিত সত্য যে আর্থিক অবস্থা যত খারাপ হোক না কেন চরিত্র সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দেশের প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ছিলেন। শুধু শ্রদ্ধাভাজন নয় সকলের মুখেই হযরতের উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা হত। তার নির্লোভ মন, উদার হৃদয়, সুমিষ্ট ব্যবহার এবং নিরপেক্ষতার জন্যে তাকে সর্বস্তরের লোকজন বিশ্বাস করত, ভালবাসত। কেবল বিশ্বাসই নয় বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ তাকে আরববাসী 'আল-আমীন' (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েও সম্মানিত করে ছিল।

একথা বাস্তব সত্য যে আর্থিক দৈন্যতার মধ্যে থাকলেও সমাজে তার মান মর্যাদা ছিল সকলের উর্ধ্বে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই সুনাম সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে বহুগুণের অধিকারিণী হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবি খাদিজা আরব জাহানের মধ্যে এত লোক থাকা সত্ত্বেও তার বিশাল বানিজ্যের বাপারের কর্ত্তা হতে ডেকে ছিলেন। সুখ শান্তির মালিকতো আল্লাহ তায়ালা তার ইচ্ছায় সব কিছু হয়ে থাকে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিবি খাদিজার মিনতি এড়াতে পারলেন না। পিতৃব্যের বিশেষ অনুমতি নিয়ে, তিনি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথ চলতে চলতে সেই বসরা নগরে যেয়ে উপস্থিত হলেন। যেই বসরা নগরে বার বছর আগে একবার চাচা আবু তালেবের সাথে গিয়ে ছিলেন। বসরা নগরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তথাকার এক খ্রীষ্টান পাদরী তার সঙ্গীদের বলতে লাগলেন আমাদের কিতাবে শেষ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে সমস্ত লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর চালচলন হাব-ভাবের সাথে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। সওদাগরদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এক মূহুর্তও এখানে অবস্থান করবেনা অতিশীঘ্রই দেশে ফিরে যাও। নতুবা দুষ্ট ইহুদীরা এর অনিষ্ট করতে পারে। সত্যি সওদাগররা খ্রীষ্টান পাদরীর কথা অনুযায়ী তড়িৎগতিতে বেচা কেনার কাজ সেরে দেশের পথ ধরলেন। এদিকে বিবি খাদিজা সংবাদ পেলেন যে তার লোকজনেরা দেশে ফিরে আসছে। পথ পানে চেয়ে দিন গুনতে গুনতে দিন ফুরাল। সে দিন শেষ বেলা বিবি খাদিজা তার বালখানার ছাদে ওঠে হাঁটতেছেন হঠাৎ রবি কিরন রাঙ্গা পাহাড় গুলির দিকে তাকিয়ে আছেন এমনি সময় দেখতে পেলেন একজন সওয়ার উটের পিঠে চড়ে আসছে। বিবি খাদিজা ভাবতেছেন লোকটি কে?

মনে হচ্ছে আমাদের আল আমীন। তাহরে কি আমার লোকজন ফিরে এল। বালাখানার ছাদে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে দেখতে সওয়ার এসে তার ঘরের দুয়ারে দাড়াল। কোরেশ কুল রানী বিবি খাদিজা বিশ্বাসী কর্মচারীকে মনের হর্ষে বরণ করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আর সকলে কোথায়?

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন তারা পেছনে আসতেছে। আমি আপনাকে সু সংবাদ দেওয়ার জন্যই সকলের আগে চলে এসেছি। সে বারে বিবি খাদিজার অনেক লাভ হয়েছে বলে তিনি হযরতের প্রতি খুশী হয়ে তাকে পুরষ্কার করলেন। হযরত পুরস্কার পেয়ে খুশী হলেও হৃদয়ের মনি কোঠায় কেবল পুরান জমাট বাধা কথা লুকোচুরি করছে, তার মনের মধ্যে দিবা রাত্রি এক কথাই ভাসছে কিভাবে দেশ, ভাইদের উদ্ধার করি। পথ চলছে এমনি সময়ও ভাবতেছে কি ভাবে এ রাক্ষুসে মানুষদের ফুলের মত নিষ্পাপ সুন্দর করে তুলি। রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান তার মহিমা বুঝবার শক্তি কারো নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ কুলের শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিনরাত বসে বসে ভাবেন, ভেবে সারা হন, কিন্তু শত চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিন কাটালেও হাল ছেড়ে দেননি। ভাবনা ভুলেন না। এমনি চিন্তা ভাবনার মধ্যে হঠাৎ এক বুড়ী এসে তার কাছে বিনয়ের সাথে দাঁড়ালো বুড়ীর নাম হল নফিসা। নফিসা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে লক্ষ্য করে বললেন, হে সুন্দর যুবক! এত ভাবছো কি? এবার তোমার ভাবনা চিন্তার কারণ শুনে, তার একটা বিহীত অবশ্যই করব। এবারে আমি তোমার বিবাহের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই আরব ভূ-খণ্ডের সেরা ধনে মানে-গুনে গৌরবে যার কোন তুলনা নেই,

সেই কোরেশকুল রানী বিবি খাদিজা তোমায় স্বামীরূপে বরণ করতে চান। তুমি কি রাজি আছ? নফিসার কথা শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ মাথু তুলে নফিসার দিকে চেয়ে বললেন, আমার সাথে উপহাস করতেছেন কেন স্বামীরূপে আমি কি তার উপযুক্ত?

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবেগ জড়ানু কণ্ঠে বললেন যার ধন নেই সেকি কোন দিন বড় মানুষের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে? আমি কি তার উপযুক্ত পাত্র? আর যদি, কোন কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও যায় তাহলে শেষে পস্তাবে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবেগ জড়ানো কথা। কথাগুলো শুনে নফিসা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, হে সুন্দর যুবক। তা আমি জামিন থাকব? পুনঃরায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, থাক, থাক আর ও কথা বলে কাজ নেই। যাকে বিবাহ করার জন্যে শত শত ধনীর ছেলে লালায়িত হয়ে ফিরছে। আর আমার মত অসহায় এতিমের প্রতি কি গুণাবলী দেখে এত মায়ার হাত বাড়াল। আচ্ছা, তুমি আজ চলে যাও। পরে আমি চিন্তা ভাবনা করে চাচাকে জিজ্ঞেস করে একথার জবাব দিব। যাবার সময়ও নফিসা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, অমন করনা বাছাঁ। আমি দু'তিন দিনের মধ্যেই তোমার মত জেনে যাব। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা অনুযায়ী নফিসা চলে গেলেন। বিবি খাদিজা নফিসার মুখে হযরতের বলা সকল কিছু শুনে হযরতকে ডেকে পাঠালেন। হযরত উপস্থিত হলে বিবি খাদিজা বললেন সত্যি নফিসার কথায় আপনি অবিশ্বাস করেছেন? আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন আমার অগাধ ধন-সম্পদ আছে বলে আমি ধনীর ছেলেকে বিবাহ করব? আসলে তা নয় একথা আপনি ভুল ভুঝছেন। আমি কোন দিন ধন-সম্পদ চাইনি। মনে রাখবেন আমার কাছে আপনার উত্তম চরিত্র ও নির্মল মনের তুলনায় অর্থ কিছু না। আপনার নিকট যে সম্পদ লুকায়িত আছে সেই সম্পদ পৃথিবীর অন্যকারো মধ্যে শত চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আপনার কাছে আমার চাওয়া পাওয়া হল আপনি এ দুঃখিনীকে চরণে ঠাই দিন। হযরত বিবি খাদিজার হৃদয়গ্রাহী আবেগ জড়ানো কথা শুনে পূর্বের মত বললেন আমি পিতৃব্যকে জিজ্ঞেস করে কাল আপনাকে সংবাদ দিব। যেভাবেই হোক শুভঃ বিবাহের কথা হযরত আবু তালেবের কানে পৌছে গেল। আবু তালিব এমন কথা শুনা মাত্রই বললেন সুখবর। কুরাইশ কুল রানী খাদিজার মত রূপগুণের মেয়ে পেয়ে মনের আনন্দে বললেন, এমন

মেয়ে আর কোথাও পাওয়া যাবে? হে মুহাম্মদ (সাঃ) মনে রাখবে, খাদিজাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলে তোমার ধর্মের অভাব মুছে যাবে, তাছাড়া নামও বাড়বে। সে আমাদের এই বাক্যে এ প্রস্তাবের সম্মতি জানালেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র মুখের সম্মতি শুনে বিবি খাদিজার বাড়িতে শুভ কাজের আয়োজন চলতে লাগল। নির্দিষ্ট দিনে হযরত তার চাচা আবু তালেব, হামজা এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধদের নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলেন। মাত্র কুড়িটি উঠ দেনমোহর ঠিক হল। বিবি খাদিজার পিতৃত্য পুত্র ওয়ারাকা বিন-নওফেল-বোনের পক্ষে উকীল হয়ে সওয়াল জবাব করতে লাগলেন আর পুরোহিত হলেন স্বয়ং আবু তালেব। যাইহোক শুভ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে গেল। বিবি খাদিজার পিতা খোয়ালিদ হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) হাতে মেয়ে তুলে দিলেন (৫৯৫ খৃঃ)।

হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন হযরতের বয়স হয়েছিল মাত্র পঁচিশ আর বিবি খাদিজার বয়স হয়েছিল চল্লিশ। বিবি খাদিজার পিতৃব্য ওমরই এই কাজ করেছিলেন।

তৎকালে আরবদেশে অনেকগুলি দল ছিল সেই বহু দলের মধ্যে থেকে কুরাইশ হল একদল। সিরিয়া অধিবাসী হযরত ইব্রাহীমের দুই পত্নী হাজেরা আর সারা। হাজেরাকে তিনি শিশু পুত্র ইসমাইল সহ মক্কার মরুপ্রান্তরে নির্বসিত করেন। এবং সারাকে নিয়ে সিরিয়ার বসবাস করতে থাকেন। সারা খাতুনের ছেলে ইসহাক এবং ইসহাকের ছেলে ইয়াকুব ইনি হযরত ইসরাঈল নামে সমাধিক পরিচিত ও খ্যাত। ইয়াকুবের বার ছেলের এক ছেলে হল ইউসুফ তিনি যেমন ছিলেন রূপে তেমনি গুণে। ইসরাঈল বংশে হযরত ঈসার জননী বিবি মরিয়ম, হযরত মুসা এবং হযরত সোলমান প্রভৃতি আরও মহাপুরুষের জন্ম, আর নির্বাসিতা হাজেরার পুত্র ইসমাঈলের বংশে আমাদের বিশ্বরাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম। ইসমাঈল হলেন মক্কা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ইসমাঈলের কোরবাণী ব্যাপার হতেই মুসলিম জগতে কোরবাণী প্রথা প্রচলিত হয়েছে। তার দশ পুরুষ পরে কোরাইশি নামে একটি লোক এই বংশে জন্ম নিয়েছিল। তার নাম অনুসারে বংশের নাম দেওয়া হয় কুরাইশ। আর এই কুরাইশের অধঃস্তন অষ্টম হাশেমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিব। আব্দুল মোতালেবের আবার দশ ছেলে। সেই দশ ছেলের মধ্যে

সর্ব শেষ ও ছোট হলেন আব্দুল্লাহ। এই আব্দুল্লাহর ঔরসেই ৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ আগষ্ট ভোরবেলা আমাদের নূরের মহানবী দোজাহানের বাদশা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। এ হল কুরাইশ বংশের মূল ইতিহাস।

এখন কুরাইশ বংশের বংশ পরিক্রমা বুঝতে আর কষ্ট হবে না। এই মহাবংশ-যে বংশে মদীনায়ে তাজেদার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেছেন, বিবি খাদিজা (রাঃ) সেই বংশের একজন। তবে তার শাখা হল স্বতন্ত্র। একথা সর্বজন বিদিত যে এক গাছে তো একটি শাখা থাকে না হাজার হাজার গাছ পালা নিয়ে এক একটা গাছ। এও ঠিক তদ্রুপ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় কুরাইশ ছিলেন একজন মানুষ। মূলত তার বংশে বাড়তে বাড়তে শেষে ছোট ছোট অনেক বংশের উৎপত্তি হয়। নবী সম্রাট বিবি খাদিজা (রাঃ) এই রূপ একটি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তারা মূলে সবাই এক। তৎকালে কুরাইশ বংশে একজন লোক ছিলেন তার নাম ছিল কামা। এই কামার ছেলে আব্দুল এজা আর আব্দুল এজার ছেলে আছাদ। আছাদের ছেলে খোয়ায়লিদ। এই খোয়ায়ালিদ হলেন বিবি খাদিজার পিতা। খোয়ায়লিদ পত্নী ফাতেমাও হলেন এই কুরাইশের কন্যা।

আমর লুইব ওপরি বংশ আমাদের বিশমরাসূল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে বিধায় এই বংশটিই কুরাইশ বংশের একটি শাখা। ইতিহাস পাঠে জানা যায় ৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবি খাদিজার জন্ম। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদের সাথে বিবাহের পূর্বে তার আরও তিনবার বিবাহ হয়েছিল প্রথম বিবাহ হয় নাব্বাসের সাথে। এখানে বিবি খাদিজার দু'টি পুত্র সন্তান হয় যাদের নাম হলো হালা ও হেন্দ। আরব জাহানে সোনালী ইসলাম ধর্ম প্রচারের পূর্বেই হালার মৃত্যু হয়। আর হেন্দ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের মধ্যে গণ্য হলেন। নাব্বাসের ইহধাম ত্যাগের পর আয়েদ মখজমার ছেলে আতিকের সাথে বিবি খাদিজার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। তৃতীয়বারে বিবাহ হয় ওস্মিয়ার সাথে। কিন্তু আফসুসের বিষয় হল কিছু দিন যেতে না যেতেই ওস্মিয়া দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন। বিবি খাদিজা আবার বিধবা হলে। তিনবার স্বামীহারা হয়ে বিবি খাদিজার মন ভেঙ্গে গেল। আর ভেঙ্গে যাওয়ার কথাও। যাইহোক তিনি ব্যথিত মন নিয়ে চোখের জলে একটা কাজ জুটল। খাদিজার পিতার

খায়ায়লিদ বুড়ো হয়েছিলেন যার কারণে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা তার পক্ষে কষ্ট হত। কাজেই ব্যবসার ভার বিধবা মেয়ের হাতে সপে দিয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর হাতে ব্যবসা বাণিজ্য বেশ উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অনেক টাকার মালিক হয়ে গেলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার সমস্ত ধন-সম্পদ বঞ্চিতের চরণে ঢেলে দিয়ে কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন, এ সকল কিছুই এখন আপনার। আমি যে ধরনের জন্যে প্রত্যাশি ও পাগলপানা ছিলাম তা আমি পেয়েছি, আর ধনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) তো তুচ্ছ সোনা চাদির কাঙ্গাল নন। তিনি যে ধনের পিছনে রাতদিন পাগল পারা হয়ে ঘুরছেন এ ধনে তা পাওয়া যায় না। যার কারণেই তিনি তার খাদ্যের অভাব মেটেছে সকল কিছুর মায়া ত্যাগ করে ঐতিহাসিক ৪৩ স্পরা পাহাড়ের গুহায় তপস্যা করতে ছুটলেন। তাঁর তপস্যা ছিল একমাত্র নিখিল বিশ্বের পথহারা পথভোলা নর-নারীকে সত্য ও সুন্দর খবর শুনিয়ে দেওয়ার। যার কারণেই এই হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থায়ই নবুয়াত প্রাপ্ত হলেন। যে নবুয়তের সুসংবাদ প্রথমে হযরত খাদিজাকে দিয়েছিলেন। সেই বিবি খাদিজার গর্বেই হযরতের তিন ছেলে এবং চার মেয়ে জন্ম। ছেলে তিনটির নাম কাসেম, তাহের ও আব্দুল্লাহ। আর মেয়ে চারটির নাম জয়নব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা। সর্ব ছোট মেয়ে ফাতেমাতুজ জুহরা। এপুস্তিকার মধ্যে তারই কথা বলব বলেই সুদীর্ঘ ভূমিকা আলোচনা।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জন্ম

হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ)-এর নাম জানেনা এমন লোক পৃথিবীর মধ্যে কোথাও পাওয়া যাবেনা। একথা সর্বজন স্বীকৃত। কেননা তার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে প্রতিটি মুসলমান জানার কথাও। যেহেতু তিনি হলেন সাইয়েদুল কাওনাইন পেয়ারা রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নয়নের মনি কলিজার টুকরা ও সৈয়দ বংশের উৎস ধারা। কেবল এটুকু বলেই তার সঠিক পরিচয় উপস্থাপনা করা মানেই হল তার সম্পর্কে জানা সম্পূর্ণতা হল না। যেহেতু তিনি ছিলেন খিলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলিফা ইসলামের বীর

সৈনিক শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)-প্রিয়তমা মহীয়সী। মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শহীদ যাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে। সেই হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইনের শ্রদ্ধেয় জননী।

হাদীসের এক বর্ণনা হতে জানা যায় রাসূলুল্লাহ নন্দিনী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা জান্নাতী রমণী কুলের সরদার বলে সকলের কাছে পরিচিত থাকবেন।

অন্য এক হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন জান্নাতী নারীদের মধ্যে চারিজন নারী সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা হলেন ইমরানের কন্যা বিবি মরিয়ম মোজাহামের কন্যা বিবি আছিয়া, খোয়ায়লিদের কন্যা বিবি খাদিজা এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্নেহের দুলালী রমণী কুল শিরোমণি হযরত ফাতেমা (রাঃ)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন কলিজার টুকরা নয়নের মনি হযরত ফাতেমা হল আমার দেহের অংশ। তাকে যে জন রাগান্বিত করল মনে রাখবে সে আমাকে ক্রোধান্বিত করে আমার সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটাল। উম্মুল মু'মীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, হে রাসূলুল্লাহ নন্দিনী ফাতেমা তোমার মাথার একগাছি কেশের মর্যাদা নিয়েও যদি আমি জন্ম নিয়ে ধারাধামে আসতে পারতাম তাহলে আমি নিজেকে গর্ব ও ধন্য মনে করতাম।

বেহেশত বাসিনী নারীদের সর্দার

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় উম্মুল মু'মীনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন আমি প্যেয়ারা রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে রাসূলুল্লাহ নন্দিনী হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) কে ছাড়া সর্ব গুনে গুনান্বিত এত উত্তম লোক আর কাউকে দেখিনি।

ওপরে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হল যে সারা মুসলিম জাহানের মধ্যে হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ)-এর সম্মান মর্যাদা [illegible] সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে ইহজগতে যেমনি সকলের শীর্ষে তেমনি পরজগতের বেহেশত বাসিনী নারীদের সর্দার রূপে গণ্য হবেন। ফাতেমা (রাঃ) কেবল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্নেহের দূলালী ও কলিজার টুকরা ছিলেন বলেই সম্মান মর্যাদার দিক দিয়ে সকলের শীর্ষে একথা বলা ঠিক হয়না। কেননা তিনি ছিলেন ধর্ম জ্ঞানে গুণে, চরিত্রে, মহিমায়

ইবাদত বন্দেগীতে, ত্যাগ সাধনায়, কষ্ট সহিষ্ণুতায় সকল নারীদের উর্ধ্বে। তার মধ্যে সর্বগুণের সমাহার ঘটেছিল বলেই তো তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে প্রয়োজনে আগমন করলেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার মর্যাদা ও সম্মানার্থে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে ধরে নিয়ে এসে নিজের কাছে বসতে দিতেন এবং বসার সাথে সাথেই স্নেহ মায়া মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হাত ও মাথায় স্নেহ চুম্বন করতেন।

'হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোথাও কোন উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত ফাতেমার সাথে দেখা করে তার কুশলাদি জেনে যেতেন এবং বাহির হতে ফিরে এসেও সর্ব প্রথম হযরত ফাতেমা (রাঃ) সাথে দেখা করতেন এবং তার কুশলাদি জানার জন্যে বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পরিচয় সম্পর্কে নির্ভর যোগ্য বর্ণনা হতে একথা সম্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়াতের পাঁচ বৎসর পরে ২০শে জমাদিউল আখের শুক্রবার ভোরে আরব ভূখণ্ড আলোকিত করে মদীনায়ে তাজেদার রাসূলুল্লাহ দো'জাহান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র ঘর ভূমিষ্ট হলেন হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ)। সত্যি, হযরত ফাতেমা (রাঃ) জোহরার মন ভুলানে সুন্দর ফুট ফুটে পবিত্র চেহারা দেখে মনে হল চির শান্তিময় বেহেস্তের এক অপূর্ব জ্যোতি নিয়ে সকলকে খুশি করতে ধরাধামে নেমে এসেছে। গোলাপ ফুলের মত মন কেড়ে নেয়ার একটি টুকটুকে শিশু তার সুন্দর চেহারায় রাসূলুল্লাহ গৃহ আলোকিত হয়ে গেল। শুধু রাসূলুল্লাহ গৃহ নয়, চন্দ্র, মুখলূকাত, আকাশের মিটি মিটি তারকা রাজি লজ্জিত হল। একথা সর্বজন বিদিত যে সাধারণতঃ নারীদের প্রসব বেদনারও প্রসবকালে কমবেশী সকলেরই কষ্ট হয় আর কষ্টতা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় কষ্ট বিধায় প্রসবকালে নারীদের কাছে সাহায্যকারী হিসেবে নারীদের থাকা উচিত। তদ্রুপই ভাগ্যবর্তি নারী হযরত খাদীজার (রাঃ) প্রসবকালে সাহায্য সহযোগীতা আল্লাহ শানুহু বেহেশত হতে চার জন নেক রমণীকে তার কাছে প্রেরণ করলেন। নেক রমণীদেরকে দেখা মাত্রই রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) ও খাদিজা (রাঃ) বুঝতে আর বাকী রইলনা যে তাদের আদরের মানিক নয়নের নবজাত শিশু কন্যা ভবিষ্যতে একজন জগৎ বরেণ্য রমণী রূপে খ্যাতি লাভ করবে। শুধু খ্যাতি নয় মুসলিম জাহানের

প্রতিটি মুসলিম নর-নারী তাঁর পবিত্র নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ কর। যার কারণেই ফুট ফুটে চেহারার অধিকারী নবজাত কন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার কিছু সদ্য ফোটা আদরের পুষ্পটি কোরে তুলে নিলেন। আদরের শিশু মানিককে কোলে নিয়ে প্রাণ ভরে চুমু খেলেন আর দু'হাত তুলে আবেগ জুড়ান কণ্ঠে প্রাণ ভরে দোয়া করলেন। দোয়ার বাণীগুলো হল।

তুমি মুসলিম জাহানে রমণী কুলের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হও। জগতে তোমার নাম চির স্মরণীয় হয়ে থাকুক। জগতে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর কাছে তুমি মাতা রূপে তাদের হৃদয়ের মনি কোঠায় চির ভাস্বর হয়ে থাক। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শুভ জন্মের সন সম্বন্ধে কিছুটা মত পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ইতিহাসবেত্তারা বলেন রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়াত লাভের পাঁচ বৎসর পূর্বে রাসূলুল্লাহ নন্দিনী হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ)-এর শুভ জন্ম হয়। আবার কোন কোন ইতিহাসবেত্তারা বলেন নবুওয়াতের পাঁচ বৎসর পরে জন্ম হয়। তবে বর্ণিত মতদ্বয়ের মধ্যে শেষোক্ত মতটি অধিকতর প্রাণিধান যোগ্য। তবে শেষোক্ত মতের সমর্থনে পেছনে একটি যুক্তি পরিলক্ষিত হয়।

নির্ভরযোগ্য এক হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে নারী কুলের শিরোমণি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শুভঃ জন্মের কিছুদিন পূর্বে কোন এক সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে সংবাদ জ্ঞাপন করে গিয়েছিলেন যে, হে রাসূলুল্লাহ দোজাহান এবারেও আপনার একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। যে কন্যা হবে জগৎ বরেণ্যা ও সকল রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'। হযরত খাদিজা (রাঃ) স্বয়ং বলেছেন কলিজার টুকরা নবজাত শিশু ফাতেমা ভূমিষ্ট হওয়ার কিছু দিন পূর্বে একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন, হে ভাগ্যবতী খাদিজা। হযরত জিব্রাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে এবারেও তোমার গর্ভে একটি কন্যা সন্তান অবস্থান করছে, যে কন্যা হবে আবেদা উত্তম চরিত্রের অধিকারণী ও মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। উক্ত ঘটনা হতে একথা প্রমান হল যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুয়ত লাভের পর হযরত ফাতেমাতুজ জোহরার (রাঃ) জন্ম হয়েছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নবুওয়াতের পূর্বে হযরত ফাতেমাতুজ জোহরার (রাঃ) জন্ম হলে তার জন্মের পূর্বে হযরত জিব্রাঈল ফেরেশতার সান্নিধ্য ও বাক্যলাপ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য নবুওয়াত লাভের পূর্বে কোন সময় হযরত জিব্রাঈল ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আগমন করেননি। অন্য এক হাদীসে বর্ণনা হতে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) মাতৃগর্ভে স্থান নেওয়ার পূর্বে হযরত জিব্রাঈল ফেরেশতা আমার নিকট উপস্থিত হলেন। তার পবিত্র হাতে ছিল একটি বেহেস্তী মেওয়া। উক্ত মেওয়াটি তিনি আমার হাতে দিয়ে আমাকে খেতে বললেন। আমি হযরত জিব্রাঈলের বিশেষ নির্দেশে সেই মেওয়াটি খেয়ে ফেললাম। সত্যি কথা বলতে কি উক্ত মেওয়াটিতে এমন একটি অপূর্ব ঘ্রাণ ছিল যা আমি পরবর্তী জীবনে দুনিয়ার নামী দামী ফল খেয়েছি এর কোন ফলের মধ্যেই এমনি ঘ্রাণ পাইনি। এর কিছু সময়ের মধ্যে আমার আদরের কন্যা ফাতেমা তার জননী জঠরে স্থান নেয়। সত্যি শুনলে আশ্চর্য লাগার কথা নবজাত শিশু হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ)-এর জন্মের পর থেকে আমি তার পবিত্র মুখে সেই বেহেস্তী মেওয়াটির ঘ্রাণ পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ নন্দিনী হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) এর জন্মের সময়ের একটি ঘটনা আলোকপাত করেছি। ভাগ্যবর্তী আমি কোন সময় কোন কষ্ট অনুভব করতাম না। এমন কি যে দিন ফাতেমা আমার উদরে থাকা অবস্থায় আমি কোন সময় কষ্ট অনুভব করতাম না। এমন কি যে দিন ফাতেমা দুনিয়ার বুকে পদার্পন করবে! সেদিন হঠাৎ আমার প্রসব বেদনা শুরু হল এ সময় আমার গৃহে আমাকে সাহায্য করার মত কোন স্ত্রী লোক আমার নিকট ছিল না। আমি সম্পূর্ণ একা বাস করেছিলাম গৃহে যাইহোক আমি একজন বাদী পাঠিয়ে আমার পাড়া প্রতিবেশি ও কতিপয় আত্মীয়কে সংবাদ দিলাম আমাকে সাহায্য করার জন্যে উপস্থিত হতে। আমার আত্মীয় স্বজন সকলে আগ থেকে জানত আসন্ন বিপদের কথা। কিন্তু তারা জেনেও কোন সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতেন না।

আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম বলে আমার প্রসব বেদনার বিপদের সময় কেউ আমাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসেনি। তারা আসলনা তো বটে তার পরও আমার প্রেরিত বাদীকে বলে দিল আরব জাহানের অনেক ধনাঢ্যবান ও শিক্ষিত যুবক হযরত খাদিজার পানি গ্রহণের জন্যে আশাবাদী ছিল। কিন্তু হযরত খাদিজা সকল যুবকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শেষ পর্যন্ত অশিক্ষিত নিঃস্ব দরিদ্র যুবক মুহাম্মদকে পতিত্বে বরণ করে আমাদের বংশের মুখে চুন কালী মেখে দিয়েছে এবং পরে ও আবার অশিক্ষিত যুবক মুহাম্মদের

নব ধর্ম গ্রহণ করে পুনরায় আমাদেরকে অপমানিত করেছে। এমতাবস্থায় তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমার প্রেরিত বাদীর নিকট হতে সব কথা শুনে মনে মনে ভাবলাম আল্লাহ তায়ালার সাহায্যই সবচেয়ে বড় সাহায্য। সে ইমা করলে মুহূর্তের মধ্যে বিপদ হতে রক্ষা করতে পারে আবার ইমা করলে বিপদের অসীম গহ্বরেও ফেলতে পারে। এমা চিন্তা ভাবনা করতেছি এমনি সময় দেখতে পেলাম আমার গৃহখানি অপূর্ব আলোকে আলোকিত হয়ে গেছে। পশ্চাতে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলাম চারজন জ্যোতিময়ী রমণী আমার পেছনে দণ্ডায়মান। আমি তাদেরকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আর অবাক বার কথাও যেহেতু আর কোনদিন তাদেরকে দেখতে পাইনি। কিছুক্ষণ পরে আমি তাদের দিকে তাকিয়ে ভীত ভাবে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাস করার সাথে সাথে তাদের মধ্যে একজন আমাকে অভয় দিয়ে বললেনমা! আপনার কোন ভয় নেই! আপনি যেই আল্লাহর তায়ালাকে স্মরণ করতে ছিলেন আমরা তারই নির্দেশে আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আমার নাম হল হাওয়া।

এরপর দ্বিতীয় রমণী পরিচয় বললেন, আপনার খেদমতের জন্যেই আমি এসেছি। আমি মিশরের বাদশাহ ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া। আর একজন বললেন আমি হলাম হযরত ঈসা রাসূলুল্লাহ (আঃ)-এর মাতা, আমার নাম হল মরিয়ম। সবশেষে চতুর্থ রমণী বললেন, আমি হলাম হযরত মুসা (আঃ) এর ভগ্নি কুলসুম আমরা সবাই আল্লাহর তায়ালার নির্দেশে আপনার সাহায্য করতে এসেছি। ভাগ্যবতীময়ী হযরত খাদিজা (রাঃ) বললেন, প্রসব বেদনার কঠিন বিপদের সময় আমি তাদেরকে আমার নিকটে পেয়ে অত্যধিক খুশী হলাম, আর মনে মনে ভাবলাম আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী, হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) কে বিশ্ববরেণ্য আদর্শ রমনী রূপে দুনিয়াতে পাঠিয়ে লি রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার একান্ত ইমার উদ্দেশ্য। যার কারণেই তাকে সর্ব গুণে গুণান্বিত করে দুনিয়াতে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাতেমা দুনিয়াতে আগমা করার পরই তার পবিত্র নাম রেখে ছিলেন ফাতেমা তবে ফাতেমা ছাড়াও আর ও কয়েকটি গুণবাচক নাম ছিল যেমা-জোহরা, যাকিয়া, রাজিয়া মারজিয়া, বতুল ও সাইয়েদা ইত্যাদি।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শৈশব জীবন

নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা সুপারিশীর কাণ্ডারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন, দয়ার আধার। যেমা ছিলেন তিনি কষ্ট সহিষ্ণ, তেমনিভাবে সততা বিশ্বস্ততা, আমানতদারী এক কর্মঠ প্রভৃতির জন্যে বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন গম্ভীর ও ভাবুক প্রকৃতির। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদের (সাঃ) মা ছিল সরল উদার, আর স্বভাব ছিল নম্র, হঠাৎ কোন ব্যাপারেই রেগে যেতেন না বরং ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। যার কারণে তিনি রাহমাতুললিল আলামীন উপাধিতে ভূষিত হয়ে দুনিয়ায় আগমা করেছেন। রাসূলুল্লাহ নন্দিনী হযরত ফাতেমা (রাঃ) বাল্যকাল হতে আদর্শ পিতার ছাচেই গড়ে ওঠেছিলেন। হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ)-এর গোটা জীবনের দিকে চোখ বুলালে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্রের প্রতিটি গুণ তার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

বাল্যকাল হতে তিনি সত্যের পূজারী

বাল্যকাল হতে তিনি সত্যের পূজারী আমানতদারী, লাজুক, নম্র ও সরলমণা ছিলেন। আশ্চার্যের বিষয় হল রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) যে বিষয়ের প্রতি বিশেষ-ভাবে সজাগ থাকতেন তিনিও সেই সকল বিষয়ের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকতেন। যেমা সততা, আমানতদারী লাজুকতা। তিনি বর্তমান যুগের ছেলে মেয়েদের মত অনর্থ সময় নষ্ট করে বাজে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ধুলাবালি নিয়ে রং তামাশা করতে অদৌ পছন্দ করতেন না। তবে এই নয় যে, পড়াপড়শী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেনা বরং তিনি তার সমবয়সী সহপাঠীদের সাথে সর্বদা সদ্ভাব বজায় রাখতেন। এমন কি যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রধান শত্রু ছিল অর্থাৎ তাকে চিরতরে দুনিয়া হতে বিদায় করা জন্যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত তাদের সঙ্গেও এক মুহূর্তের জন্যে খারাপ ব্যবহার করতেন না। সেই শত্রুরাও হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তবে একথা সর্বজন বিদিত যে কেহ যদি উত্তম চরিত্র ও ভাল গুণের অধিকারী হয় তাহলে প্রধান শত্রু তাকে খারাপ জানলেও তার আদর্শ ও চরিত্র সম্পর্কে সর্বদা প্রশংসা করে যা ঘটেছিল হযরত ফাতেমার (রাঃ)-এর বেলায়।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বাল্যকালের আনন্দ মুহূর্তের দিনগুলোর প্রতি

তাকালেও দেখা যায় তিনি কোন সময় পাড়া প্রতিবেশীর ছেলে মেয়েদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করেন নি বরং এমনও দেখা গেছে ঐ বাল্যবয়সে পাড়া প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের ঝগড়া বিবাদের মিমাংশা মিটিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, এটা ছিল তার বাল্যকালের চরিত্র। তিনি কোন সময় পাড়া প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের দোষ-ত্রুটি ও কোন অভিযোগ পিতা-মাতার কাছে দিতেন না। আবার পাড়া প্রতিবেশী ছেলে মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার কাছে ফাতেমা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তুলতেন না। বরং পিতা-মাতার কাছে ফাতেমার (রাঃ) বিভিন্ন গুণাবলী আলোচনা করতেন।

শৈশব ও বাল্যকাল তিনি কেমন শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। আল্লাহর রাসূলুল্লাহর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাংসারিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তার সংসারে অভাব অনটন সর্বদা লেগেই থাকত। কিন্তু আল্লাহর রাসূলুল্লাহ কোন সময় অত্যধিক অভাব অভিযোগের মধ্যে থেকেও নাখোশ হন নি। বরং সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন যাইহোক এমন অভাব অনটনের সংসারে লালিত পালিত হয়ে ও ফাতেমা (রাঃ) কোন সময়ই পাড়া প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের মত এটা নেই, ওটা দাও, এরকম আবদার করতেন না। সত্যি। ফাতেমা (রাঃ) কে দেখে মনে হত পার্থিব কোন ভোগ বিলাসের প্রতি তার কোন মনোযোগ নেই। ফাতেমা (রাঃ) যে জগত বরেণ্যা আদর্শময়ী হয়ে ইতিহাস তথা প্রতিটি মানুষের হৃদয় মন্দিরে চির জাগ্রত হয়ে থাকবে তা তার বাল্যকালের আচরণ থেকে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি তার বাল্যকাল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন, এ সময় সুযোগ হলে পিতার নিকট অবস্থান করে তার উপদেশ বাণী শ্রবণ করতেন কেবল উপদেশগুলো শ্রবণ করতেন, তা নয় বরং তা বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে মহানবী (সাঃ) অন্যকে যে উপদেশ দিতেন না শ্রবণ করে ঐসব আদেশ উপদেশ নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) দয়ার প্রতীক ছিলেন, যার কারণেই বাল্যকালে কারো দুঃখ কষ্টের কথা শুনলে নিজে অস্থির হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদের (সাঃ) কোন বিপদ আপদ থেকে মুক্তি ও মঙ্গলের জন্যে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার দরবারে কান্না ভেজা কণ্ঠে দু'হাত তুলে মুনাজাত করতেন। শৈশব হতে ফাতেমা (রাঃ)

ছিলেন নির্ভীক, তেজস্বিনা, ও বক্তা। তিনি উচিত কথা বলতে শত্রু-মিত্র কাউকে পরওয়া করতেন না, বরং বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সর্বদা উচিত সত্য কথা বলতেন। ভাগ্যবতী নারী হযরত খাদিজা (রাঃ) সর্বদা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে চোখে চোখে রাখতেন। কেননা তাঁর ও একান্ত ইচ্ছা ছিল মেয়েকে আদর্শ নারী হিসেবে গড়ে তোলা তিনি ফাতেমা (রাঃ)-কে বাল্যকালে ধর্মের কথা শুনাতেন এবং বাস্তব জীবনে হাতে নাতে শিক্ষা দিতেন। একজন আদর্শ মা-ই আদর্শ শিশু গড়ে তুলতে পারে। যার জলন্ত প্রমাণ হল হযরত খাদিজা ও ফাতেমা অর্থাৎ যেমন মা তেমন মেয়ে।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) মায়ের আদেশ ও উপদেশাবলী মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন এবং বাস্তব জীবনে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করতেন। ধর্মের কথা শুনতে যেয়ে আদরের সাথে মাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করতেন। তবে কোন প্রশ্ন অহেতুক ছিলনা। একদিন তিনি তার মাতাকে প্রশ্ন করলেন আম্মা আমাকে বলুন তো রহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা তো সর্বশক্তিমান ও নিরাকার আখেরাতে কি তার সাক্ষাৎ পাব? মেয়ের কথা শুনেমা খাদিজা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালা যেমনিভাবে আমাদের চলতে হুকুম করেছেন তেমনিভাবে যদি আমরা চলি তাহলে আমরা অবশ্যই পরলোক তার দর্শন পাব। প্রকৃত পক্ষে পিতা-মাতার শিক্ষাই হল আসল শিক্ষা। ছোট বেলা ছেলে মেয়েরা পিতা-মাতার নিকট হতে যে শিক্ষা পায় তাই কোমল প্রাণে চিরদিনের জন্যে অঙ্কিত হয়ে যায়, এবং সেই শিক্ষাই ভবিষ্যত জীবনের চলার পাথেয় হয়।

বর্তমান যুগের ছেলে মেয়েদের মত হযরত ফাতেমা (রাঃ(-স্কুল কলেজ, বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না ছেলে-মেয়েরা তার অমূল্য শিক্ষার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আদর্শ শিক্ষা এ জীবন চলার পথ নির্দেশিকা একমাত্র আদর্শ পিতা-মাতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাই আদর্শ পিতা-মাতাই আদর্শ ছেলে-মেয়ে গঠন করতে পারে। বাল্যকাল হতেই হযরত ফাতেমা (রাঃ)-দুনিয়ার ভোগ বিলাস আরাম আয়েশের প্রতি লোভ করতেন না। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে আদর করে, বতুল বা সংসার বিরাগানি বলে ডাকতেন।

বাল্যকাল হতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিতা-মাতাকে অগাধ ভক্তি করতেন, শুধু ভক্তি নয় পিতা-মাতার আদেশ উপদেশ তিনি তার জীবনের

শ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতিটি গুণের সমাহার ঘটেছিল হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর প্রতিটি গুণের সমাহার ঘটেছিল হযরত আয়েশা (রাঃ) তার এক বর্ণনায় বলেছেন, হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা, (রাঃ)-কে দেখলে মনে হত আমি রাসূলুল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ)কে দেখেছি। কেননা তার উত্তম চরিত্রের সকল মহৎগুণাবলীই আমি ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবনে দেখতে পাই"

শৈশবে ফতেমা (রাঃ) পিতা-মাতাকে কতদূর ভালবাসতেন ও ভাল জানতেন তা নিম্নের ঘটনাটির মাধ্যমেই অনুধাবন করা যেতে পারে। কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক স্থান হতে বাড়ি যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ এক খোদাদ্রোহী কোরাইশ তার পাশ রোধ করে দাড়াল শুধু পথ রোধ করে দাঁড়াল তাই নয় বরং তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে নানা ভাবে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করতে লাগল। তাদের মধ্যে হতে এক কুরাইশ আক্রোশ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাথায় কতগুলো ধূলো নিক্ষেপ করলো। কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক দয়ার আধার কোন কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতোমধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে এমন অমানবিক দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। বরং তড়িৎ গতিতে পিতার নিকট এসে মাথার ধূলাবালি ঝরাতে ঝারতে নরাধম খোদাদ্রোহী কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন তোমরা কি মানুষ না অমানুষ তোমাদের মধ্যে মানবতার লেশ মাত্র নেই। আমার পিতা তোমাদের কি ক্ষতি করেছে যে তার সাথে তোমরা এমন অমানবিক অত্যাচার করতেছো? যোগ্য পিতার আদর্শবান মেয়ে হযরত ফাতেমার (রাঃ)-তিরস্কারে খোদ্রাদ্রোহী কুরাইশগণ কোন কিছু না বলে লজ্জিত হয়ে ওখান হতে চলে গেলেন।

এমনিভাবে বহু ঘটনা রয়েছে তার জীবনে পিতা-মাতার বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট দেখলে মাতার বিপদ আপদ দেখলে ফাতেমা (রাঃ) নিজেকে সুস্থ রাখতে পারত না। বরং তা লাঘব করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। বাল্যকালেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মাতার স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রাঃ) কে হারিয়ে অন্তরে পেলেন কঠিন আঘাত। যেই আঘাত সহ্য করার মত না। কেননা হযরত খাদিজা (রাঃ) কেবল তার স্ত্রীই ছিলেন তা নয় বরং তিনি ছিলেন তার বিভিন্ন বিপদ আপদের সমসঙ্গী, যার কারণে হযরত খাদিজা

(রাঃ)এর বিদায়ের পর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। মনে হত যেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তর ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে। এদিকে মাতৃহারা হযরত ফাতেমা (রাঃ) শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। কেননা হযরত খাদিজা (রাঃ) এ মেয়েকে অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে ভাল বাসতেন আর ফাতেমা (রাঃ)-ও মাকে জীবন দিয়ে ভালবাসতেন। যার কারণেই মাতার বিদায়ের কথা অন্তর হতে মুছতে পারেন না। একবার ফাতেমা মায়ের কথা মনে করতে করতে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেন আব্বাজান আমার যখনই আম্মাজানের কথা মনে পড়ে তখন আমার কিছুই ভাল লাগে না। আপনি হযরত জিব্রাঈলের (আঃ) নিকট জিজ্ঞেস করে দেখেন আমার মাতা কেমন আছেন। মাতৃহারা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর এমন কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্তরে খুবই ব্যথা পেলেন। আদরের দুলালীকে আবেগ জড়ান কণ্ঠে স্নেহের সুরে শান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে ফাতেমা (রাঃ)। তোমার আম্মার মত মা পৃথিবীতে কজন আছে তাকি তুমি একবারও ভেবে দেখেছো? আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা বেহেস্তের মধ্যে তোমার মাকে শান্তিতে রেখেছেন।

তুমি তার জন্যে কোন সময় করবেনা। বরং সর্বদা তার মাগফিরাতের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। অন্য আর এক দিনের ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবা গৃহের মধ্যে নামায পড়তেছিলেন এমন সময় একদল খোদাদ্রোহী কুরাইশ অদূরে দণ্ডায়মান হয়ে হযরতকে নানা অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ ও উপহাস করছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায রত অবস্থায় সিজদায় গেলেন এমন সময় নরপিচাশ খোদাদ্রোহী কুরাইশরা একটা উটের নাড়ীভূড়ি এনে চাপিয়ে দিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাথার ওপর। মুহূর্তের মধ্যে তার পরিধেয় জামা কাপড় নষ্ট হয়ে গেল, শুধু জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে হল তা নয় নাড়িভূঁড়ির চাপে কোন ভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাথা তুলতে পারছিলেন না, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন দৃশ্য দেখে নরপিচাশ কোরাইশ অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পরলেন।

হযরত ফাতেমা তথায় উপস্থিত হয়ে পিতার এরূপ অবস্থা দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না বরং কেঁদে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চোখের পানি মুছতে মুছতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাথার ওপর হাতে নাড়ীভুঁড়িগুলো ফেলে দিলেন। নাড়ীভুঁড়ি ফেলে দিয়ে মনের চাপা ক্ষোভ দূর

করতে পারলেন না বরং পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়েই কঠোর ভাষায় তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর তিরস্কার মূলক কথা শুনে খোদাদ্রোহী কাফেরগণ লজ্জিত হয়ে সেখান হতে চলে গেলেন। ঐতিহাসিক ওহুদের যুদ্ধে সময়ের এক ঘটনা, খোদাদ্রোহী কুরাইশগণ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন সহস্রাধিক সৈন্য নিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে কেবলমাত্র সাতশত সৈন্য নিয়ে তাদের সম্মুখীন হন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সৈন্য কাফেলা সুনিশ্চিত জয়ের মুখে আনন্দে মেতে ওঠে এমন কি মনের খুশীতে পশ্চাতে সুরক্ষিত গিরিপথ ছেড়ে গণিমতের মাল সংগ্রহ করার জন্যে সৈন্য কাফেলার প্রত্যেকেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদের (সাঃ) সৈন্য দলের আনন্দ ও গণিমতের মাল সংগ্রহের সময়ের সুবর্ণ সুযোগে খালেদ ইন ওয়ালিদের নেতৃত্বে আবু সুফিয়ানের একদল সৈন্য পেছনে অরক্ষিত গিরিপথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সৈন্য কাফেলার ওপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের কারণেই সুনিশ্চিত জয়ের মুখে মুসলিম দলের পরাজয় ঘটে। কাফিরগণ পাথর মেরে রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভূ-পতিত করে এমনকি পাথরের আঘাতে তার পবিত্র দাঁত ভেঙ্গে যায়। এমনি পাথরের আঘাতে তার পবিত্র দাঁত ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ কুলের শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এই ঐতিহাসিক পরাজয় এ আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অস্থির হয়ে পড়লেন; শুধু অস্থিরই হলেন না বরং ঐ মুহূর্তে তার শিশুপুত্র হাসান কে রেখে কতিপয় মুসলিম রমণীসহ উহুদ ময়দানে উপস্থিত হন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) উহুদ ময়দানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তার আব্বা জানের পবিত্র দন্ত ও ললাট মুবারক হতে অঝরে রক্ত ঝরছে। অজ্ঞান হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে আছেন। এমন হৃদয় গ্রাহী দৃশ্য দেখে হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র মস্তক কোলের ওপর তুলে নিলেন। আর তার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ে বক্ষস্থল প্লাবিত হয়ে গেল। ইসলামের বীর সৈনিক শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে দিলেন সেই পানি দ্বারাই ফাতেমা তার আব্বাজানের ক্ষতস্থান ধৌত করে শুষ্ক ঘাস পুড়ে ক্ষত জায়গার মধ্যে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য বিষয় হল এমন অনেক ঘাটনার মধ্যে

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর অগাধ বিষয় হল এমন অনেক ঘাটনার মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর অগাধ পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যে পিতৃ ভক্তির কথা আজও ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বাল্যকাল হতে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-আরাম আয়েশ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন মোটেই পছন্দ করতেন না। কোন ক্ষেত্রে তার মধ্যে অহংকারের প্রতিচ্ছবি দেখা যেত না। তবে দেখার কথাও না যেহেতু তিনি পার্থিব জগতের সুখ শান্তি ভোগ বিলাস পরিত্যাগ পরকালের পাথেয় সংগ্রহে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন, তবে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত বলে সাংসারিক কাজকর্মে কোন সময় উদাসীন ছিলেন না। কোন এক সময়ের ঘটনা তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বয়স মাত্র সাত বছর। বাড়ির সকলে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তার বড় বোনেরা ভাল ভাল জামা কাপড় পরিধান করে প্রস্তুতি নিলেন, আর হযরত ফাতেমা (রাঃ)-পড়ছিলেন মাত্র একখানা ছেড়া কাপড়। তিনি সেই ছেড়া কাপড়খানা পরে বোনদের সাথে বিবাহ অনুষ্ঠানে রওয়ানা হলেন।

তার ছেড়া কাপড় দেখে বোনেরা ভাল কাপড় নিতে বললে তিনি জবাব দিলেন হে বোনগণ! ভাল ও নতুন কাপড়ের কি প্রয়োজন। আমাদের আব্বাজান তো সর্বক্ষেত্রে অনাড়ম্বর জীবন যাপন পছন্দ করেন। বিবি ফাতেমা (রাঃ) বাল্যকালে পাড়া প্রতিবেশী বাজে ছেলে মেয়েদের সাথে রং তামাশা ও চলাফেরা করা তো মোটেই পছন্দ করতেন না। তবে এটা নয় যে তার সম-বয়সীদের সাথে মিলতনা বরং তিনি উত্তম চরিত্রের ছেলে-মেয়ের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতেন। ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায় পরবর্তীকালে যে সমস্ত নারীরা সমাজের প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে তাদের উত্তম চরিত্র ও গুণের দ্বারা জয় করেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বাল্যকালের খেলার সাথী ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর দুই কন্যা হযরত আসমা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত উমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফসা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত উমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফসা এবং হযরত জোবায়রের কন্যা ফাতেমা ওরা সকলেই ছিলেন হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ)-এর বাল্যকালের খেলার সাথী। হযরত ফাতেমা শৈশবকাল হতেই বাহিরে ঘুরাফিরা মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি গৃহে মাতার সাহচার্যহ অধিক

পছন্দ করতেন। কেননা মায়ের চালচলন কথা-বার্তা আদেশ উপদেশ অনুকরণ করে তার মত জীবন গঠন করার ইচ্ছে শৈশবকাল হতেই তার মধ্যে জাগ্রত ছিল। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে জ্ঞানে গুণে আদর্শে ও চরিত্রে সকল নারীদের শীর্ষে তার নাম স্থান পেয়েছে।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) মাতা-পিতার খেদমত যেভাবে করতেন

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শৈশবকালের অধ্যায়ে বিভিন্ন ঘটনা ও কথার মধ্যে মাতা-পিতার ভক্তি সেবা ও শুশ্রুষার কথা আলোচিত হলেও পাঠক পাঠিকাদের সামনে রাসূলুল্লাহ নন্দিনী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বড় বোনদের বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর পিতা-মাতার সংসারে একমাত্র ফাতেমাই ছিলেন স্নেহ মমতার অধিকারিণী। পিতা-মাতা উভয়ের মায়া মমতা, স্নেহ, পেয়ে ফাতেমা আনন্দে জীবন কাটাতে লাগলেন, কিন্তু তার এ সুখ ও আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। কেননা হযরত খাদিজা (রাঃ) বিভিন্ন রোগ শোকে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়লেন একদিকে বার্ধক্য অন্য দিকে বিভিন্ন ধরনের রোগ যার কারণে আস্তে আস্তে শরীর দূর্বল পথে ধাবিত হচ্ছে। হযরত খাদিজা রোগাক্রান্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সেবা যত্ন করতে পারছে না বলে সর্বদা দুঃখ করতেন। এবং প্রায় কান্নভেজা কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ আমি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি আমার জীবনের জন্যে কোন মায়া নেই আমার আফসূসের বিষয় হলো জীবনের শেষ মূহুর্তে পেয়ারা রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরণ সেবার সুযোগ হতে বঞ্চিত হলাম। হযরত আমার মত হতভাগী দুঃখিনী নারী এ পৃথিবীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর আবেগ জড়ানো কান্না ভেজা কণ্ঠে কথাগুলো শুনে কিশোরী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) মায়ের হৃদয়ের চাপা দুঃখ যাতনা সবই অনুধাবন করতে পেরে ছিলেন। তাই কিশোরী কন্য হযরত ফাতেমা (রাঃ) মায়ের চোখের তপ্ত অশ্রু নিজ হাতে মুখে দিয়ে মাকে জড়ায়ে মায়া মমতা ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন। আম্মাজান আপনার স্থানে ফাতেমা (রাঃ) সর্বদা আব্বাজানের খেদমত ও পরিচর্যা করব। আমার জীবন থাকতে আব্বাজানের খেদমতের সামান্যতম ত্রুটি আমি করব না. বিধায় আপনি কোন চিন্তা করবেন না। মৃত্যু পথযাত্রী হযরত খাদিজা মেয়ের কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। আর আনন্দিত

হওয়ার কথাও যেহেতু এই কিশোরী বয়সে তার মুখ থেকে যে সকল শান্ত্বনা মূলক কথা বের হয়েছে, সাধারণত এই বয়সের ছেলে মেয়েদের মুখ হতে বের হয় না। হযরত খাদিজা (রাঃ) কেবল খুশীই হলেন না বরং তাকে কাছে ডেকে বুকে টেনে স্বহস্তে তার পিঠে ও মাথায় বুলায়ে তার জন্যে প্রাণ ভরে দোয়া করলেন।

হে আল্লাহ তুমি আমার মেয়েকে তোমার প্রিয় আবেদা বান্দী বানাও। তাকে জগতের বুকে মহা মর্যাদাপূর্ণ মাতৃ আসনে অধিষ্ঠিত করো। দোয়া করার পর মেয়েকে আবার কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলায়ে মৃত্যু যাত্রী মাতা খাদিজা (রাঃ) বললেন, হে ফাতেমা! তুমি আমার প্রাণের মা। মনে রাখবে এ পৃথিবী হতে আমি চলে যাবার পর কোন দুঃখ করবেনা বরং আমার মাগফিরাতের জন্যে সর্বদা দোয়া করবে। তবে তোমার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ হল আমার মৃত্যুর পরে তোমার আব্বাজানের খেদমত এবং সেবা যত্নের ভার তুমি গ্রহণ করবে। মনে রেখ তোমার আব্বার খেদমত ও সেবাযত্ন করলে ইহকাল ও পরকালে তোমার কল্যাণ হবে। আমি রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার পিতার খেদমত করার সুযোগ দান করেন এবং তার খিদমতের বিনিময় আল্লাহ যেন তোমার সমস্ত মানব জাতির জননীর আসন দান করেন। তোমার সুনাম সুখ্যাতি যেন পৃথিবীর বুকে চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকে। সত্যি! রাসূলুল্লাহ দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জননী মৃত্যু পথ যাত্রী নারী কুলের শিরোমণি হযরত খাদিজার (রাঃ) হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা ও আশিবাঁদ বিশ্বপ্রভূ আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা সত্যিই প্রতিফলিত হয়েছিল। খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সুনাম সুখ্যাতি যশ ও মর্যাদা বিশ্বব্যাপী অক্ষয় হয়ে আছে এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর হৃদয়ে ও ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মাতার ইন্তেকাল

অধিকাংশ বর্ণনা কারীর মতে, রাসূলুল্লাহ দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বয়স যখন মাত্র ১১ (এগার) বছর তখন তার মাতা হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ) নবুওয়তের দশম সালে মক্কায় ইন্তেকাল করেন

ইন্তেকালের সময় হযরত খাদীজাতুল কোবরার (রাঃ) বয়স হয়েছিল পয়ষট্টি বছর। রাসূলুল্লাহয়ে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে নিজ মাথার পাগড়ীর দ্বারা তার কাফন তৈরি করে পরালেন এবং তাকে তার "জিহন" নামক স্থানে দাফন করলেন। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ হযরত (সাঃ) নিজে প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনীর দেহমোবারক কবরে শোয়ালেন এবং মাটি চাপা দিলেন।

মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে যে কিভাবে জানাযা নামায না পড়ে কবরে রাখলেন এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে বলা যেতে পারে যে তখন জানাযার নামাযের হুকুম জারী হয়নি। যার কারণে অধিকাংশ সীরাত লেখকদের ভাষ্য মতে রাসূলুল্লাহ দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) মাত্র এগার বছর বয়সে মাকে হারিয়ে ইয়াতীম হলেন। মাকে হারিয়ে পিতা কর্তৃক লালিত পালিত হতে লাগলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) নাবলেগ আবস্থায় মাকে হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কাঁদার কথাও, কেননা মায়ের সাহচর্যই ছিল তার সময় কাটাবার প্রধান সম্বল। সেই মাতা তাকে ছেড়ে চলে গেছে এখন সে হতভাগা হয়ে দুঃখের সাগরে ভাসতেছে। তবে শুধু ফাতেমাই (রাঃ) যে দুঃখে শোকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তা নয় বরং হযরত খাদীজা (রাঃ) কে হারিয়ে রাসূলুল্লাহয়ে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চরম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সাথে সাথে আপন অভিভাবক চাচা আবু তালিব ও নারী কুলের শিরোমণি হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) কে হারিয়ে ভেঙ্গে পড়লেন। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এ বছরটির নাম রাখলেন শোকের বছর। এদিকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) মাকে হারিয়ে সারাক্ষণ কাঁদতে লাগলেন। তার শান্ত্বনা দিবার মত কেহই ছিল না। একমাত্র পিতা ছিল তাকে শান্ত্বনা দেওয়ার মত অভিভাবক। তবে পিতা শান্ত্বনা দেওয়ার মত থাকলেও তিনি ও তার শোকে দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শোকের বছর আরবের খোদাদ্রোহী কাফিররা হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালাতে লাগলেন। যা খুবই অমানবিক। মেয়েকে শান্ত্বনা দেওয়ার মত যেমন ছিলেন হযরত খাদীজা (রাঃ)। তেমনি ভাবে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছাড়া পিতাকে শান্ত্বনা দেওয়ার মত তার কেহ তার পাশে ছিল না।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) হৃদয়ের মনিকোঠায় হতে মায়ের শোক ভুলতে

পারলেন না। বরং মায়ের কথা মনে পড়ার সাথে সাথে তার অজান্তে দু'চোখে হতে অশ্রুর বন্যা নামত। তবে আদর্শ মায়ের রেখে যাওয়া আদর্শবান মেয়ে কেবল চোখের পানি ফেলে বুক ভাসাতেন না বরং নীরবে বসে বসে মাতা-পিতার জন্যে দোয়া করতেন। অবশ্য একথা সর্বজন স্বীকৃত যে করুনার প্রতীক রাহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার মাতৃহারা আদরের দুলালী কন্যাটিকে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে তার মাতৃ অভাব পূর্ণ করবার জন্যে সর্বাত্তক চেষ্টা চালাতেন। শত চেষ্টা করলেও আল্লাহর রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মন খারাপ দেখতেন তখন তাকে আদর সোহাগ দিয়ে বিভিন্ন কথা বলতেন। পিতা যেমনিভাবে মেয়ের অভাব পুরণের জন্যে চেষ্টা করতেন তেমনি হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও মায়ের মত অন্তরের ভালবাসা দিয়ে পিতার হৃদয়ের চাপা দুঃখ বেদনাকে দূর করার জন্যে চেষ্টা করতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাতৃস্থানে ফাতেমা (রাঃ)

পিতা-মাতার আদরের ধন কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজের প্রাণের চেয়ে ও পিতা-মাতাকে বেশি ভালবাসতেন পিতা-মাতার আরাম আয়েশ সুখ শান্তির জন্যে নিজের হাজারও সুখকে বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করতেন না। পিতা-মাতার বিপদ দুঃখ কষ্টের সময় তাকে দেখে চেনাই যেতনা তার চেহারার মধ্যে পরিবর্তন এসে যেত। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিপদ আপদ দুঃখ কষ্টা লাঘব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বিষন্ন মনে হত। হযরত ফাতেমা (রাঃ) যেমনি ভাবে পিতা-মাতাকে নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন তেমনি তার পিতা-মাতাও তাকে তাদের প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। যে মাতাকে তিনি নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন সেই মাতাকে হারিয়ে তিনি কত যে অসহায় হয়ে পড়লেন যা লেখনীর মাধ্যমে বর্ণনা করা যাবে না। মাতাকে হারিয়ে তিনি কোথাও শান্তি খুজে পাচ্ছেন না। চারদিকে শূন্য হাহাকার। মাতৃহারা আদরের কন্যাকে শান্ত্বনা জানায়ে পিতা রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন মা ফাতেমা। তুমি এভাবে আর ভেঙ্গে পড়না 'মা' তোমার মলিন চেহারা দেখলে আমি আর স্থির থাকতে পারিনা। আমার হৃদয়ের মধ্যে ও দুঃখ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। তুমি আর তোমার মাতার কথা মনে করে কেঁদোনা। কেননা আমাকে হযরত

জিব্রাঈল (আঃ) বলেছেন, তোমার মাতা বেহেস্তের মধ্যে সুখে শান্তিতে অবস্থান করিতেছেন। সত্যি পিতার পবিত্র মুখে পরোলোকগতা মাতার বেহেশতে সুখে শান্তিতে অবস্থানের সংবাদ শুনে ফাতেমা (রাঃ)-এর মলিন মুখে হাসি ধরল। নারী কুলের শিরোমণি হযরত খাদীজা (রাঃ) কে হারানোর ব্যথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তরে হর হামেশাই শোকের ঝড় বইতে ছিল। হযরত খাদিজার (রাঃ) এর কথা মনে করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি নেমে আসত। তবে তাঁর জন্যে এত মায়া মমতা হওয়ার কারণ ছিল হযরত খাদীজা (রাঃ) তো শুধু তার প্রিয়তমাময়ী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিপদে আপদে সুখে দুঃখের একমাত্র সঙ্গী সাথী।

হযরত খাদিজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ছায়া বৃক্ষের মত। হযরত খাদীজা (রাঃ) বেঁচে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মনে করতেন তার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছেন। কেননা সকল সমস্যা ও অভিযোগের কথা বলা মাত্রই সঠিক সমাধান পেতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে খাদিজা (রাঃ) বন্ধুর মত পরামর্শ দিতেন। ভগ্নির মত স্নেহ করতেন। যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবন সঙ্গিনীকে হারানোর ব্যথা অন্তর হতে ভুলতে পারে না। যাইহোক এত দিনের হারানো ব্যথা কিছু প্রশমিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু নবুওয়াতের এই দশম বৎসরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনে নেমে আসে আরেকটি শোকের ছায়া। অন্তর হতে একটি শোক ভুলতে, না ভুলতে আবার নেমে আসল শোকের কাল ছায়া। হযরত খাদীজা (রাঃ) এর পরলোক গমনের কিছুদিন যেতে না যেতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্নেহময় চাচা আবু তালিব ও দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন। চাচা আবু তালিবের মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়ায় তার আপন বলতে আর কেহ নেই। সুখ দুঃখের কথা জানাবার মত আর কেহ দুনিয়ায় নেই।

এতদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল দিকের বাধা বিপত্তি ও আপদে বিপদে একমাত্র আশ্রয় স্থল এবং আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম প্রচারের একমাত্র সহায় ছিলেন তার স্নেহময় চাচা আবু তালিব। কিন্তু চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর তার সেই পরম নির্ভয় আশ্রয় স্থালটিও হারিয়ে গেল। যার কারণে আবু তালিবের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেকে খুব অসহায় মনে করলেন। এদিকে আবু তালিবের মৃত্যুর পরে তাদের আধিপত্য

সর্ব ক্ষেত্রে খাটাতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওপর নানা ধরণের অত্যাচার চালতে লাগলো। পুর্বের চেয়ে জুলুম অত্যাচার শত গুণে বৃদ্ধি পেল। আবু তালিব জীবিত থাকা অবস্থায় তার ভয়ে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদের (সাঃ) এর প্রতি অধিক জুলুম অত্যাচার করতে সাহস পায়নি। কিন্তু আবু তালিবের মৃত্যুর পর তাদের পথের কাটা সরে গেল যার কারণে তারা অমানবিক অসহ্যনীয় নির্যাতন চালাতে লাগলো। এই মহা বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ) ও চাচা আবু তালিবের কথা মনে করে নীরবে কাঁদতেন আর রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনার জন্যে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতেন। মানবতার মহান শিক্ষক দয়ার আধার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহাবিপদের সময় খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জননীর মত প্রতি মুহূর্তেই স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে তাকে শান্ত্বনা দিতেন যে শান্ত্বনা তাকে বিপদ সহ্য করার মত অনুপ্রেরণা দিত এবং কর্ম ক্ষেত্রে উৎসাহ দিত হযরত ফাতেমা (রাঃ) পূর্বের চেয়েও আর বেশি করে পিতার সেবা খেদমত করতে চেষ্টা করতেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শৈশবেমাতাকে হারিয়ে যে দুঃখ বেদনা পেয়েছিলেন সত্যিই, হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্নেহ মায়া মমতা পেয়ে মনে করতেন যেন ফাতেমার মাঝে তার হারানো মায়ের স্মৃতিতে দেখতে পায়। হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার আব্বাজান রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জননীর মত সর্ব ক্ষেত্রে উপদেশ দিতেন শুধু উপদেশ নয় মায়া মমতার বন্ধনে তাকে আবদ্ধ রেখে অতীতের দুঃখ বেদনার দিন গুলির ব্যাথিত স্মৃতিতে হৃদয় হতে মুছে ফেলতে চেষ্টা করতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসা ও সেবা যত্নে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাতৃ আসন দখল করে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর হৃদয়ে চির জাগ্রত হয়ে রয়েছে। কেননা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মত পিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘর হতে বাইরে কোথাও গেলে ফিরে না আসা পর্যন্ত আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) মায়ের মত দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেতেন। রাত জেগে পিতাকে পাহারা দিতে ও তিনি কষ্টবোধ করতেন না বরং মনে মনে ভাবতেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) খিদমত করতে পেরেছি

বলে জীবন ধন্য। মাতা খাদিজাকে (রাঃ) হারাবার পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) সর্ব ক্ষেত্রে পিতার খেদমত করতে বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর হৃদয়েমায়ের কথাটি সর্বদা লুকোচুরি করত। মাতা বলেছিলেন "হে ফাতেমা! আমি যখন থাকব না তখন তোমার আব্বাকে খেদমত করবে" তাঁকে কষ্ট দেবেনা। যার কারণে হযরত ফাতেমা (রাঃ) মাতার কথাকে প্রতি পদে পদে স্মরণ করে চরতে চেষ্টত-করেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শিক্ষা লাভ

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-বাল্যকালে পিতৃগৃহে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের কথা আলোচনা করার পূর্বে প্রসঙ্গ কারণে তৎকালীন আরব জাহানের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি-নীতি ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া উচিত। একথা বাস্তব যে, ইসলাম পুর্বে যুগে আরব জাহানে শিক্ষা, দীক্ষা ও কৃষ্টি সভ্যতা বলতে কিছু ছিল না। যার কারণে আরবের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর এবং মুর্খ ছিল। তৎকালে লেখাপড়াকে একটি ঘৃনা কাজ বলে ধারণা করা হত।

তারা লেখাপড়াকে ঘৃণিত কাজ মনে করলেও মুখে মুখে কবিতা রচনা সাহিত্য চর্চা বংশের গৌরব সম্বলিত কবিতার ছন্দ তারা বলে বেড়াতো। এসব ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আসরও বসত। তবে এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল, তাদের এসব জ্ঞান গরিমার সবকিছু ছিল তাদের কণ্ঠস্থ। লেখনির মাধ্যমে ধরে রাখার কোনমাধ্যম ছিলনা। এছাড়া প্রতি বছর কাসীদা কবিতার বংশ গৌরব দানশীলতা ইতিহাস আলোচনা ও অতিথি পরায়ণতার প্রতিযোগিতা করার জন্যে ঐতিহাসিক ওকাজ এবং যুল মাজ্জান্নাতে মেলা বসত। তবে এই প্রতিযোগী ঐতিহাসিক মেলায় কেবল পুরুষরাই উপস্থিত হত না। বহু দূরদূরান্ত হতে মেয়ে কবিরা এসে উপস্থিত হত মানবতার শিক্ষক সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র মক্কা ভূমিতে ইসলাম প্রচার শুরু করার পর থেকে ঐতিহাসিক হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত যারা সোনালী ইসলামের অমীয় সুধা গ্রহণ করে ইসলামের সুশীলতা ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র একজন মহিলা ও সতেরজন পুরুষ পড়া-লেখা জানতেন বলে কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়। সেই ভাগ্যবর্তী মহিলাটি ছিলেন বনী আদা গোত্রের হযরত শাফা বিনতে আব্দুল্লাহ। এই ভাগ্যবতী মহিলা পরবর্তিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও

করে ছিলেন। যার কারণে হযরত আলী (রাঃ) পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকে হাশেমী। এবং রাসুলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই। আরব ভূ-খণ্ডের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তৎকালে হাশেমী পরিবার আরব জাহানে ও কুরাইশ বংশে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে সকলের শীর্ষে ছিলেন।

পবিত্র কাবা গৃহের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায় দায়িত্ব অর্পিত ছিল বনী হাশেমের ওপর। এই বিশিষ্ট মর্যাদার দিক থেকে গোটা আরব ভূমিতে তারা ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর পিতা আবু তালিব তৎকালে মক্কার গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইয়াতিম রাসূলুল্লাহ দয়ার আধার মুহাম্মদ (সাঃ) তার স্নেহ ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়ে ছিলেন এবং নবুওয়তের মহান দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর তার ছত্রছায়ায় মক্কার কাফির মুশরিকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কাফির মুশরিকদের যে কোন অত্যাচার ও নির্যাতনের সময় আবু তালিব রাসুলুল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পাশে এসে দাঁড়াতেন। এককথায় আবু তালিব এর ছত্র ছায়ায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আশ্রয় নিতেন, রাসূল (সাঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতা ও তার প্রতি সমর্থনের কারণে খোদাদ্রোহী জালিম কুরাইশরা তাকে ও তার পরিবার বর্গকে নানা ধরনের নির্যাতন করেছে। এমন কি তাদের একটি পাহাড়ের উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে রাখে।

তাদের সাথে সকল প্রকার ব্যবসায়ী লেন-দেন বন্ধ করে দিয়েছে। এ ছাড়া তাদের সাথে বিবাহ শাদীর সম্পর্কও ছিন্ন করে দেয়। এককথায় তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে পেরেশানীর মধ্যে ফেলার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। কিন্তু আবু তালিব শতবাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্বেও নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রিয় ভাতিজাকে নিজের স্নেহ হতে বঞ্চিত করেন নি। চাচা আবু তালিবের হৃদয়কে ঈমানের আলোয় আলোকিত করাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা।

তিনি ব্যক্তিগত সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'জাহান হযরত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যে খেদমত ও উপকার করেছেন তাকে তার বিনিময়ে চির শান্তিময় বেহেস্ত সম্পদ দান করাই ছিল হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা। যার কারণেই চাচা আবু তালিবের ইহধাম ত্যাগের সময় আল্লাহর রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অধিক আগ্রহের সহকারে বুকভরা আশা নিয়ে

কালিমায়ে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

মৃত্যু পথের যাত্রী আবু তালিব জবাবে বলেন, হে আমার প্রিয় ভাতিজা! মক্কার কুরাইশদের নিন্দার ভয় যদি না থাকত তাহলে আমি মনের আনন্দে তোমার কালিমায়ে তাওহীদের দাওয়াত সাদরে গ্রহণ করতাম। সীরাতে ইবনে হিশামে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যে বলা হয়েছে আবু তালিব প্রাণ বায়ু বের হবার সময়কালে কালেমায়ে তাওহীদ পড়ে ছিলেন। তবে এ বর্ণনাটি দুর্বল বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্নেহের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং মক্কার খোদাদ্রোহী কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মোকাবিলায় দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে তাকে সাহায্য করতেন এ জন্যে ইসলামের ইতিহাসে কৃতজ্ঞতা সহকারে তার নাম চিরদিন চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। তারে খোদা হযরত আলী (রাঃ)-এরমাতা সাহেবানী হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিনতে আসাদও মায়া মমতা ও স্নেহ সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে লালন পালন করেন।

কোন এক বর্ণনা হতে জানা যায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে হিজরত করে মদীনায় গমন করেন তার ইহধাম ত্যাগের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পবিত্র জামা দিয়ে তার কাফন তৈরি করেন এবং তাকে নিজেই কবরের মধ্যে শায়িত করেন। এই মহিলার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ দেখে লোকজন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বললেন চাচা আবু তালিবের পর এই সুচরিত্রা ও কোমল হৃদয়ের অধিকারিণী মহিলার কাছে সবচেয়ে আমি ঋণী।

হযরত আলী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আলী (রাঃ) এর বয়স যখন মাত্র দশবছর তখন তার স্নেহশীল অভিভাবক বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে নবুওয়তের মহান দায়িত্ব লাভ করেন। হযরত আলী (রাঃ) সর্বদা থাকতেন। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ধর্ম ইসলামের সঠিক চেহারা সর্বপ্রথম তার চোখে ধরা পড়েছিল কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত খাদিজা (রাঃ) কে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত দেখে তিনি খুবই খুশি হলেন। বালক আলী বাল্যসুলভ বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা দু'জনে কি

করেছিলেন। আমাকে সে সম্পর্কে একটু বললে আমি খুব খুশী হতাম। বালক আলীর কথার জবাবে রাসূলল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) -এর চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজের নবুওয়তের সংবাদ দিয়ে শিরক ও কুফরীর নিন্দা করে তাকে তাওহীদের তথা আল্লাহর একাত্ববাদের দাওয়াত দিলেন।

বালক আলী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয় কথাগুলো শুনে অবাক হলেন। আর অবাক হবার কথাও, যেহেতু এ ধরনের কথা আর কোন দিন শ্রবণ করেনি। যার কারণে বালক আলী অধীর আগ্রহ সহকারে রাসূলল্লাহ (সাঃ) কে বললেন এ সম্পর্কে আমার পিতার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এ ঘটনা বাইরে প্রকাশ না করে তাকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে বললেন। প্রিয় পাঠক পাঠিকগণ রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার মহিমা বুঝার শক্তি কারওনেই, যাইহোক পরের দিন বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেমাত্র দশ বছর বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম ধর্মের অমীয় সুধা পান করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন কিশোরদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বিবাহের প্রস্তাব

হযরত ফাতেমাতুজআল্লাহ জোহরা (রাঃ) আনহা পবিত্র মদীনা শরীফ গমন করার পর থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসা শুরু হল। বহুদূর দুরান্তে হতে শিক্ষিত ধন্যবান ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুদর্শন যুবক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদরের কন্যা কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুজ জোহরাকে (রাঃ) বিবাহ বন্দনে আবদ্ধ করার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রস্তাব পাঠাতে লাগলেন। এমনকি আনসার ও মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে জীবন উৎসর্গ করে রাসূলুল্লাহর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) কে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন স্থান হতে প্রস্তাব আসলেও মহানবী কাউকে কোনরূপ কথা না দিয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। কে দিতে পারবে আমার আদরের কন্যা নয়নের মণি কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুজ জোহরার ইজ্জত ও সম্মান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দিবা রাত্রি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করলেও তার মনের মধ্যে একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে কার কাছে বিবাহ দিলে তার দীন ঈমান ও ইজ্জত আবরু রক্ষা পাবে। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাতেমা (রাঃ) কে মূলত এমন একজন সৎ, যোগ্য জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, আল্লাহভীরু,

ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ ও সম্ভ্রান্ত ছেলের কাছে অর্পণ করতে রাসূলাল্লাহ (সাঃ)-এর মনের একান্ত প্রত্যাশা।

দূর-দূরান্ত হতে যত প্রস্তাব আসুক না কেন কোন পাত্র রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর চিন্তাও আশা অনুযায়ী হয় না। যার কারণে কাউকে কোন রূপ কথা না দিয়ে চুপ করে থাকেন। মূলত আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কলিজার টুকরার জন্যে কোন ধন্যবান পাত্র চান না। তিনি চান প্রকৃত ঈমানদার, হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর শরীরের গঠন প্রকৃতি, সৌন্দর্য রূপগুণ ভদ্রতা, নম্রতা আচার ব্যবহার কথাবার্তা দানশীলতা, অতিথেয়তা, আমানতদারী, পিতা-মাতার আনুগত্যতা, ইবাদত গুজার, আল্লাহ ভীরুতা, তাকওয়া সুতীক্ষ্ম প্রজ্ঞা, চাল-চলন, কর্ম সম্পৃহা, শোয়া-বসা, খাওয়া-পরা, শিক্ষা-দিক্ষা, আদব- আখলাক, ধৈর্য, ধ্যান তপস্যা তাওয়াক্কুল ইত্যাদি রকমের মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রায় সকলে[redacted] জানা ছিল। যার কারণে তাদের মধ্যে হতে অনেকেই হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া জন্যে সরাসরি রাসূলূল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর প্রবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে বুক ভরা আশা নিয়ে প্রস্তাব দিতেন।

যোগ্যদের মধ্যে হতে সর্ব প্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পর হযরত উমর ফারুক (রাঃ) হযরত ফাতেমার (রাঃ) কে বিবাহ করার জন্যে আবেদন পেশ করলেন। তাদের বিশেষ আবেদন শুনা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আবেদনের কোন জবাব দিলেন না। পরিশেষে সত্যের সৈনিক শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) আবেদন করলেন হযরত আলী (রাঃ) আবেদন করার সাথে সাথে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, বিবাহের মোহরানা আদায় করার মতো তোমার নিকট কি আছে? তখন হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন একটি ঘোড়া ও একটি বর্ম ছাড়া আর কিছু নেই। হযরত আলী (রাঃ) এর সাহসী মনের সাহসী কথা শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন যুদ্ধের জন্যে অবশ্যই ঘোড়া দরকার বিধায় তুমি বর্মটি বিক্রি করতে পার। এরপর অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে হযরত আলী আদবের সাথে সেখান হতে বিদায় নিয়ে গেলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমনি যোগ্য তার মনের মত পাত্র চেয়েছিলেন রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা তাই মিলায়ে দিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে শুভ বিবাহ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর পবিত্র মুখের কথা ও নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের বীর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শুভ বিবাহের মহোর আদায় করার জন্যে খুশি মনে আপন লৌহ বর্ম বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বর্মটি বিক্রি করার জন্যে গ্রাহকের সন্ধান করতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উপযুক্ত গ্রাহক না পেয়ে বর্মটি নিয়ে পরের দিন হযরত আলী (রাঃ) হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হলেন। ঐ মুহূতে রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দরবারে হযরত আবুবক্কর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত উমর ফারুক (রাঃ) হযরত উসমান যিন নুরাইন (রাঃ) সহ আর অনেক সাহাবা উপস্থিত ছিলেন।

হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই উপস্থিত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ যে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে আলী (রাঃ)-এর বর্মটি ক্রয় করতে পার। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কথা শুনা মাত্রই কালবিলম্ব না করে হযরত উসমান (রাঃ)-দাঁড়িয়ে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি ৪৮০ দিরহাম মূল্য দিয়ে বর্মটি ক্রয় করতে প্রত্যাশি। হযরত উসমান (রাঃ)-এর কথা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্মটা হযরত উসমান (রাঃ)-হাতে দিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) মনের খুশীতে নগদ ৪৮০ দিরহাম দিয়ে বর্মটি কিনে নিলেন এবং এই অর্থ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে রাখলেন। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ টাকা নিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) সেই টাকাগুলো দিয়ে বিবাহের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

এদিকে হযরত উসমান (রাঃ) আনন্দ মহূর্তে অত্যন্ত খুশী হয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্যে লোহবর্মটি ফেরত দিলেন। বর্মটি ফেরত দেওয়ায় হযরত আলী(রাঃ) আনন্দিত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুশী হয়ে হযরত উসমান (রাঃ) কে প্রাণ ভরে দোয়া করলেন। আর হযরত বেলাল (রাঃ) কে আতর ও খোশবু আনার জন্যে বাজারে পাঠালেন। কোন বর্ণনা হতে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমর, সালমান ফারসী, সাদ ইবনে আবু ওক্কাস প্রমুখ সাহবাগণ (রাঃ) কে বাজারে পাঠিয়ে দু'টি বালিশ, একটি পরদা, এক খানা চাদর, দু'খানা বাসন দু'টি বাজু বন্ধ, দু'টি পেয়ালা এবং একটা মাটির বাসন কিনে আনালেন। এদিকে হযরত আলী (রাঃ) প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে এনে উপস্থিত হলেন। এর পরে রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) এর নির্দেশে হযরত আলী (রাঃ) কে মসজিদের সামনে উপস্থিত করা হল। এর পরে রাসূল (রাঃ) নিজেই মিম্বরে বিবাহের খোতবা পাঠ করলেন। খোতবা শেষ করেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপস্থিত মেহমান সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা সকলেই জেনে রাখ এবং সাক্ষী থাক যে আমি চারশ দিরহাম মহরের বিনিময়ে আলী ইবনে আবু তালিবের সাথে আমার কন্যা হযরত ফাতেমাকে বিবাহ দিচ্ছি। এরপরে শেষে তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলেন আমি আমার কন্যা ফাতেমাতুজ জোহরাকে চারশ দিরহাম মহরের বিনিময় তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম তুমি এতে সম্মতি আছ কি?

হযরত আলী (রাঃ) আদবের সঙ্গে উত্তর করলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি কবুল করলাম। এর পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপস্থিত মেহমানদেরকে নিয়ে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবেগ জড়ান কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন এবং দম্পতির সুখী হওয়ার জন্যে দোয়া করলেন। দোয়ার শেষে উপস্থিত মেহমানদের মধ্যে খেজুর বিতরণ করলেন। রাসূলুল্লাহজির নয়নের মনি হযরত ফাতেমা (রাঃ) শুভ বিবাহের সময় হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ) ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে সমস্ত স্ত্রী ছিলেন তারা সকলেই এই বিবাহের আসবাবপত্র সহ সকল ব্যবস্থা করেন। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশেষ নির্দেশে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বিবাহের আনুষঙ্গিক কাজে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেন। তিনি ঘর দুয়ার লেপেদেন এবং বিছানা ঠিকঠাক করে দেন, এমনকি নিজ হাতে খেজুরের বাকল ধুনে বালিশ বানিয়ে দেন মেহমানদের সামনে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, আমি ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহের মত এমন সুন্দর ও উত্তম বিবাহ অনুষ্ঠান আর কোথাও দেখিনি।

স্বামীর ঘরে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কর্ম ব্যস্ততা

হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) শুভ বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রিয় জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কে আপন হুজরায় নিয়ে গেলেন। হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতেমা আলী (রাঃ) কে একত্রে নিজের কাছে বসালেন এবং

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে এবং উপদেশ দিয়ে জামাতাকে উত্তমভাবে মেহমানদারী করালেন। এরপরে নিজের অযুর পানি জামাতা আলী ও ফাতেমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন।

তারপর প্রিয় জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কে নিজের ঘরে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর সঙ্গে একত্রে রাত্রি যাপন করতে দিলেন। আল্লামা সোলায়মান নদভী (র) সাহাবা চরিত্রে বর্ণনা করেন যে বিবাহের পূর্বে হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে অবস্থান করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করেন। কোন কোন বর্ণনা হতে জানা যায় বিবাহের পরে হযরত আলী (রাঃ) প্রায় দশ এগারমাস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে অতিবাহিত করেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিত্রালয়ে থাকাকালীন সাধ্যানুযায়ী স্বামীর খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। মেয়ে ও জামাতার মধ্যে যেন মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সে দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। বিবাহের পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিতার বাড়িতে প্রায় এগারটি মাস অতিবাহিত করেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহের সময় ও বয়স

অধিকাংশ সীরাত বর্ণনা কারীদের মতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় হিজরী সনে হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শুভ বিবহারে কার্য সুসম্পন্ন হয়। তারপরএই পবিত্র বিবাহ মসজিদে নব্বীতে হয়েছিল। তরকাতে ইবনে সাদ ও খোলাফায়ে রাশেদীনে উল্লিখিত আছে যে শুভ বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ কন্যা হযরত ফতেমাতুজ জহরার (রাঃ) বয়স হয়েছিল কেবলমাত্র ১৪ বছর। অন্যদিকে শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) বয়স হয়েছিল মাত্র ২৩ বছর। আল্লামা শিবলি নোমান ও সৈয়দ সোলায়মান নদভী (র) সীরাতুননবী কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে হযরত আলী (রাঃ) যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন তার বয়স হয়োছলমাত্র একুশ বছর পাঁচমাস মতান্তরে চব্বিশ বছর। এর মধ্যে প্রথম মতটিই সর্বাধিক সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় হিজরী সনের ব্যাপারে কারো কোন মন্তব্য নেই।

হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামীর গৃহে যাত্রা

হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর পিতৃগৃহে রয়ে গেলেন। যেহেতু হযরত আলীর (রাঃ) সংসার ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) ফাতেমাকে সর্বদা কাছে রাখতে চান কিন্তু মনে চাইলেই তিনি তাকে নিয়ে রাখবেন কোথায়? তার তো কোন ঘর বাড়ি নাই। তিনিই থাকেন পরের বাড়িতে পরের ঘরে। হযরত আলী (রাঃ) নিজেই চলতে পারেনা তারপর অন্যের চিন্তা কিভাবে করবে? তাঁর অবস্থা এমনও হয় যে এক বেলা আহার করেন আর তিন বেলা পেটে পাথর বেধে থাকেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) গৃহে এলে তিনি খেতে দেবেন কি? হযরত আলী (রা) মত হযরত ফাতেমা (রাঃ) তো দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারবে কি? সব চিন্তা করে হযরত আলী (রাঃ) নিজেকে অসহায় ভাবছেন। বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে না থেকে পিত্রালয়ে থাকবেন এটা স্বামীর জন্যে খুব বেদনা দায়ক।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তা করে হযরত আলী (রাঃ) মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও মনে মনে ভাবেন আদরের দুলালী বতুলকে আমার কাছে আনার পয়োজন নেই। কেননা সে আমার অভাব অনটনের সংসারে এসে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। মনে মনে অনেক সংকল্প করলেও ফাতেমা (রাঃ)-এর কথা মনে করলে তাকে সার্বক্ষণিক কাছে পাওয়ার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনের সকল সংকল্প ফেলে প্রতিষ্ঠা করলেন যেভাবে হোক বতুলকে তার গৃহে আনতে হবে। শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রাঃ) প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে নিয়ে স্বাধীনভাবে ঘর সংসার করার জন্যে একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। কিন্তু মনের মধ্যে আশার জাল বুনলেও অতিশয় লাজুক হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে গিয়ে বলতে পারলেন না। যে আপনার কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে আপনার ঘর হতে আমার ভাড়া করা জরাজীর্ণ ছোট বাড়িতে নিয়ে যব। অনেক দিন যাবতই হযরত আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ) কে তার গৃহে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিন্তু লাজুক আলী বলতে সাহস পাচ্ছে না।

কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক দয়ার আধার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আকার ইঙ্গিতে কিছুটা বুঝতে পেরে একদিন বললেন, হে আলী আমার কলিজার

টুকরা ফাতেমা (রাঃ) তোমার গৃহিনী তোমার সৌভাগ্যের কারণ হোক। প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রিয়কথা শুনে হযরত আলী মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। বহু দিন যাবত হযরত আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ) কে তার গৃহে নিয়ে আসবেন এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে মন খারাপ করে ফেলছেন। হযরত আলীর ছোট ভাই আকীল তার ভ্রাতার মনের চঞ্চলতা ও গতিবেগ দেখে বুঝতে পারলেন যার কারণে একদিন ভ্রাতার হাত ধরে বললেন আমার মনের আন্তরিক ইচ্ছা আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে নিজ গৃহে বাস করুন।

ভ্রাতার কথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতির কথা বললেন। আকীল ভ্রাতার এমন কথা শুনামাত্র হযরত আলী (রাঃ) কে নিয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর গৃহে গেলেন। আকীল হযরত আলীর ইচ্ছা ও বাসনার কথাগুলো ভাই হযরত আকীলের মুখে শুনে শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রিয়রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দরবারে যেয়ে উপস্থিত হলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) সালাম দিয়ে বললেন আপনার চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) আপনার কলিজার টুকরা তার স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে নিজের গৃহে নেওয়ার জন্যে অভিলাষী হয়েছেন। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) অতিশয় লাজুক বলেই এ বিষয়ে আপনাকে জানাবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারছেনা। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মুখের কথাগুলো শুনে হযরত আলী (রাঃ) কে বিশেষ ভাবে তার সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্যে বললেন। লাজুক হযরত আলী আদবের সাথে তার সামনে বসলেন। হযরত আলী (রাঃ) কে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন হে আলী তোমার কি ইচ্ছা যে আমি তোমার স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) কে বিদায় করে দেই।

হযরত আলী (রাঃ) আদবের সাথে বিনীতভাবে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হ্যাঁ এটা আমার আরজ। হযরত আলী (রাঃ) আদবের সাথে বিনীতভাবে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হ্যাঁ এটা আমার আরজ হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখে হ্যাঁ বোধক কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু দিরহাম তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন। বাজার থেকে আটা, পনির, ঘি, ইত্যাদি কিনে আন আল্লাহর প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ হাতে রুটির সঙ্গে পনির ঘি ইত্যাদি মেখে লজীস নামে এক প্রকার খাদ্য তৈরি করলেন এবং উপস্থিত সকলকে খেতে দিলেন একটি পেয়ালাতে অবশিষ্ট জলীস ভরে তিনি বললেন এই টুকু হল আমার বতুলের এবং তার স্বামীর জন্যে

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ক্রমে ফাতেমা (রাঃ) কে উপস্থিত করা হলে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কপালে চুমু দিয়ে জামাতা হযরত আলী (রাঃ) এর একটি হাত টেনে নিলেন এবং তার ওপর আদরের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) হাত রেখে বললেন, হে আলী! তোমার জন্যে মাতৃহারা, কলিজার টুকরা, নয়নের মনি হযরত ফাতেমা (রাঃ) কল্যাণের কারণ হোক, ফাতেমা (রাঃ) কে লক্ষ্য করে আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন, হে ফাতেমা (রাঃ) তোমার স্বামী আমার জামাতা হযরত আলী (রাঃ) সার্বিক দিক দিয়ে প্রশংসার যোগ্য। এখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে নিজ গৃহে বসবাস কর।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ও দোয়া নিয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) যখন হযরত আলীর (রাঃ) গৃহে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তথায় গিয়ে হাজির হলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে দেখা করতে বলেছিলেন না। যার কারণে দরজায় দন্ডয়মান হয়ে অনুমতি চাওয়া মুহুর্তের মধ্যে দরজা খুলে গেল এবং তিনি ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তারপরে একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই পাত্রের পানিতে তার পবিত্র হাত ডুবালেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর বুকে ও বাহুতে পানির ছিটা দিলেন। এর পরে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে তার কাছে ডাকলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) লজ্জা জড় সড়ো হয়ে পিতার সামনে হাজির হলেন। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ তার ওপর ও তার পবিত্র হাত দিয়ে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন, হে 'মা' ফাতেমা (রাঃ) তোমার বিবাহ আমি স্ব-খান্দানে যোগ্য পাত্রের সাথে দিয়েছি।

উক্ত ঘটনাটি হযরত আসমা বিনতে উমাইস এমনভাবেই বর্ণনা করেছেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বাসর রাতে আমি তাদের বাড়িতে ছিলাম। সকাল বেলা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন ভাই আলীকে আমার কাছে উপস্থিত কর। প্রিয়রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এমন কথা শুনে আমি বললাম ভাইয়ের কাছে কলিজার টুকরা ফাতেমা (রাঃ) কে বিবাহ দিলেন কেমন করে? তার কথার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে উম্মুল মাইস, ঠিক করেছি, এর পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পবিত্র মুখের কথা ও কণ্ঠ শুনে অন্যান্য মহিলারা সরে দাড়ালেন, তখন আমি পর্দার আড়ালে চলে কিন্তু যেতে না যেতে হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) শরীর মুবারকে পানি ছিটিয়ে দোয়া করলেন। তারপর হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে কাছে ডাকলেন। অত্যান্ত লজ্জায় নত হয়ে রাসূলুল্লাহ দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার সামনে উপস্থিত হলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফাতেমার (রাঃ) মাথায় হাত রেখে বললেন 'মা' ধন্য তুমি। ধীর হও, এরপরে দু'হাত তুলে তাদের জন্যে প্রাণ ভরে দোয়া করলেন এবং তাকে বললেন 'মা' কখন স্বামীর আদেশ অমান্য বা অবহেলা করনা। তার সুখ দুঃখের সমান ভাগ হয়ে তার সেবায় নিজেকে রাখবে। 'মা' মনে রাখবে, কিয়ামতের দিন মেয়ে লোকদের মধ্যে যে সমস্ত মহিলা দোযখ বাসী হবে তাদের মধ্যে হতে অদিকাংশ মহিলা হবে, স্বামীর আদেশ অমান্য কারিনী। সর্বদা একথা স্বরণে রেখে স্বামীর ঘর করবে। আর কোন সময় কোন ব্যাপারে কিংবা জিনিসের জন্যে স্বামীকে চাপ দেবে না। তবে আমি জানি হযরত আলী দরিদ্র ও শিক্ষিত, জ্ঞানী সে কখন এমন কিছু করবে না যাতে তুমি তার ব্যবহারে মনে ব্যাথা পাও। আর শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সে যেন তোমার হাসি মুখ দেখতে পায়। 'মা' মনে রাখবে, স্বামী যদি স্ত্রীর মুখ মলিন দেখে, এতে যে দুঃখ হয় এরুপ দুঃখ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। স্বামীর সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে আদবের সঙ্গে ও হাসি মুখে কথা বলবে। যে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকে সে স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট থাকেন। এমন উপদেশমূলক কথাগুলো বলে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চলে আসলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) স্বামীর বাড়িতে উঠলেন

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাসগৃহ হতে জামাতা হযরত আলী (রাঃ)-এর ভাড়াটিয়া বাসগৃহটি ছিল একটু দূরে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর খোঁজ খবর নিতে প্রায় যেতেন বলে, তার যাতায়াতে কষ্ট হত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে একদিন কন্যা ফাতেমা (রাঃ) কে বললেন 'মা' তোমাকে দেখতে আমার প্রায় আসত হয়, বিধায় আমার ইচ্ছা তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হৃদয়ের একান্ত কথাগুলো জেনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজেই বললেন আব্বাজান আপনার পাশেই হারিসা (রাঃ) ইবনে নু'মানের অনেক বাড়ি রয়েছে। তাকে আপনি আমার জন্যে একটি বাড়ি খালি করে দিতে বলুন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমার (রাঃ)-এর আবেদন মূলক কথা শুনে বললেন, হে ফাতেমা (রাঃ)। হারিসা ইবনে নু'মানের নিকট একটি বাড়ি চাওয়াকে আমি খুবই লজ্জাবোধ করি। লজ্জাবোধের অন্যতম কারণ হল যেহেতু সে প্রথমে আল্লাহ ও তার রাসূলের রেজামন্দি হাসিলের জন্যে কয়েকটি বাড়ি দিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিত্বের অধিকারী লজ্জাশীলতার প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) চুপ হয়ে গেলন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফাতেমা (রাঃ) প্রত্যাশিত আবেদনমূলক কথাগুলো হযরত হারিসা (রাঃ) ইবনে নুমানের কানে গেল। তখনি তিনি জানতে পারলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা নয়নের মনি ফাতেমা (রাঃ) কে তার নিকটে আনার ইচ্ছা করে কিন্তু বাড়ি পাচ্ছেনা এমনকথা শুনামাত্র তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত হারিস (রাঃ) ইবনে নুমান হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনি আপনার আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে আপনার নিকটবর্তী কোন বাড়িতে রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন।

হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি আপনার সার্বিক সহযোগিতার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত আছি। আমি অতি সত্তর আপনার বাসগৃহের নিকটবর্তী বাড়িটি খালি করে দিচ্ছি। আপনি ফাতেমা (রাঃ) কে ডেকে পাঠান। আল্লাহর রাসূল হারিসার কথা শুনে বললেন, তুমি যা শুনেছ তা অবশ্যই সত্য। আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু তোমাকে বরকত ও কল্যাণ দান করুন। যাইহোক হযরত হারিসের কথা অনুযায়ী হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ) হারিসার (রাঃ) প্রদত্ত বাড়িতে উঠলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অনুসরণ যোগ্য মহিলা। কথা-বার্তা, চাল-চলন, উঠা-বসা হাসি তামাসা সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সর্বোত্তম উদাহরণ।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফাতেমার মধ্যে দ্বীনদারী, পরহেজগার, মুত্তাকিরা, প্রভৃতির মহৎগুণগুলি পাওয়া যেত। খোদাদ্রোহী কুরাইশদের বয়কটের সময় শিয়াবে আবু তালিব বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি অনেক দুঃখ

কষ্ট সহ্য করেছিলেন, যে দুঃখ কষ্টের কথা ইতিহাসের পাতায় চির অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের সময় অনেক পথ ধরে হাঁটার কারণেও তিনি খুব ক্ষীণাঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল অনেক কষ্ট করার পরও তিনি নিজ হাতে যাঁতা ঘুরিয়ে আটা তৈরি করতেন। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। হযরত ফাতেমা (রাঃ) সাংসারিক সকল কাজ নিজে হাতে করতেন কিন্তু শত কষ্ট হলেও দুঃখ করতেন না বরং স্বামীকে নিজ হাতে রান্না বান্না করে খাওয়ানো এবং কুপ হতে পানি উঠানোকে খুবই আনন্দের কাজ মনে করতেন। তবে হযরত আলী (রাঃ) সাংসারিক অনেক কাজে সময় সুযোগ পেলে ফাতেমা (রাঃ) কে সাহায্য করতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামী হযরত আলী নিতান্ত একজন গরীব মানুষ ছিলেন। যার কারণে তিনি প্রিয়তমা স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) সাংসারিক কাজে সাহায্য করার জন্যে বাসায় কোন দাসী-বাদী রাখতেন না।

হযরত আলী (রাঃ) এত গরীব ছিলেন যে, অনেক সময় তাদের দিনের পর দিন, রাতের পর রাত না খেয়ে থাকতে হত। কোন এক দিনের ঘটনা একবার তাদের অবস্থা এমন হল যে ঘরে খাবার মত কিছুই ছিল না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে প্রায় আট প্রহর পর্যন্ত ভুখা কাটানোর পর হযরত আলী কোন একস্থানে কাজ করে মাত্র এক দিরহাম পেয়েছিলাম। কাজের বিনিময়ে এক দিরহাম নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন অনেক রাত। হাট বাজারের দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে তবুও অনেক খোঁজাখুঁজির করার পর এক দোকান হতে এক দিরহামের যব কিনে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরলেন। এদিকে অভুক্ত ফাতেমা (রাঃ) স্বামীর পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ স্বামীকে আসতে দেখে মনের মধ্যে আনন্দের ফোয়ারা জেগেছে। আর আনন্দে মেতে উঠার কথাও যেহেতু দিনের পর দিন না খেয়ে স্বামীর অপেক্ষায় আছেন। অভুক্ত ফাতেমা (রাঃ) স্বামীকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। স্বামী ছাড়া দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম নিচ্ছেন এই ফাকে যবগুলো নিয়ে দ্রুত পিষলেন। রুটি তৈরি করে স্বামীকে খেতে দিলেন।

স্বামী হযরত আলী (রাঃ) এর খাওয়ার শেষ হওয়ার পর তিনি খেতে বসলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) যখন আলী (রাঃ) কে খাওয়ায়ে নিজে

খেয়েছেন এমনি সময় হযরত আলী আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রায়ই বলতেন আমার কলিজার টুকরা হযরত ফতেমা (রাঃ) হল রূপে গুণে আদর্শে উত্তম চরিত্রে দুনিয়ার সর্বোত্তম মহিলা। কোন এক বর্ণনা হতে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কোন এক আবেগ মুহূর্তে ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলেন, রাসূলুল্লাহজীর হযরত ফাতেমার (রাঃ) ও তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ)-এর অবস্থা আল্লাহর রাসূলুল্লাহকে অবহিত করাবেন এই বলে যে আপনার আদরের কন্যা মাতৃহারা ফাতেমা (রাঃ) গরীব স্বামীর গৃহে চাক্তি (যাতা) চালাতে চালাতে হাতে দাগ পড়েছে, পানির কলস টানতে টানতে কোমর কালসিটে হয়ে গেছে, ঘর বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে যেয়ে পরিধেয় কাপড় চোপড় সর্বদা ময়লাযুক্ত হয়ে থাকে।

প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাঃ)

ফাতেমা (রাঃ) নিজে বললেন, রুটির জন্যে আটার খামীর তৈরি করতে করতে আমার দু'হাতের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে। এমন দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাদের সাংসারিক জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। এমনি মুহূর্তে শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) জানতে পারেন যে মুসলমানদের হাতে যুদ্ধে বন্দী বহু বাদী এসেছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র মুচকি হাসি দিয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে বললেন, তোমার সাংসারিক কাজে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যে একজন দাসী নিয়ে আসি, আমার একান্ত বিশ্বাস তোমাকে যেভাবে আল্লাহর রাসূল ভালবাসেন ও ভালজানেন এবং তোমার জন্যে যে মায়া মমতা তাতে তুমি কোন দাসির জন্যে আবেদন করামাত্র তিনি দান করবেন। স্বামী হযরত আলী (রাঃ)-এর বুদ্ধি ও কথা অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন বটে অতিশয় লাজুক হযরত ফাতেমা (রাঃ) কিছু বলতে সাহস পেলেন না। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর উপস্থিতি দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) জবাবে বললেন আপনাকে সালাম দিতে উপস্থিত হয়েছি।

দাসী না নিয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) স্বামী গৃহে পৌঁছার সাথে সাথে হযরত আলী (রাঃ) বুঝতে বাকি রইল না যে ফাতেমা (রাঃ) লজ্জার কারণে প্রিয়রাসূলুল্লাহর দরবারে যেয়ে আসল সংবাদ গোপন রেখেছিলেন। যাইহোক,

হযরত আলী (রাঃ) নিজে ফাতেমা (রাঃ) কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার আদরের কন্যা হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) লজ্জার কারণে তার আসল কথা গোপন রেখেছিলেন। সে আপনার কাছে তার সাংসারিক কাজের সহযোগিতার জন্যে গণীমতের একজন দাসী প্রার্থনা করেছে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন তোমাদের খেদমতের জন্যে আমি কোন কয়েদীকে দিতে পারি না। কেননা এখন আসহাবে ফছ্ফার খাওয়া পড়ার দায় দায়িত্ব আমাকেই করতে হবে। আমি কেমন করে তাদেরকে ভুলে যাব, যারা নিজেদের বাড়ি ঘরের মায়া মমতা ত্যাগ করে বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালা ও তার প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সন্তুষ্টির জন্যে বুভুক্ষা ও দারিদ্র্যের পথ বেছে নিয়েছে। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা কে বললেন হে, মা ফাতেমা (রাঃ) ধৈর্যধর, সত্যিকার অর্থে সেই হল উত্তম মহিলা যার মাধ্যমে পরিবারে লোকজন উপকৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয় কথাগুলো হৃদয়পটে অঙ্কিত করে স্বামী স্ত্রী একত্রে তাদের বাসস্থানে ফিরলেন। রাত্রি বেলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মেয়ের ঘরে উপস্থিত হলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সালাম দিয়ে বসার স্থান করে দিলেন। তখন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বললেন, আমার নিকটে তোমরা যা দাবি করেছিলে তার তুলনায় উত্তম বস্তু তোমরা রাজি আছ কি? তখন তারা আদরের সাথে নম্র কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। এর পরে তাদের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমাকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) নামাযের পর তিনটি বাক্য পাঠ করার জন্যে বলেছেন, সেই বাক্য তিনটি হলো তোমরা নামাযের পর, ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, পাঠ করবে। রাতে বিছানায় যাওয়ার পূর্বে ও প্রতিদিন এ আমল করবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে এই দোয়া পাঠ করার জন্যে বলেছেন আমি সেই দিন হতেই আজ পর্যন্ত এই পবিত্র বাক্য সমূহ পাঠ করতে ভুলে যাইনি, হযরত আলী (রাঃ)-এর এমন কথা শুনামাত্র এক সাহরাসূলুল্লাহ বললেন তাহলে কি আপনি সিফফিনের যুদ্ধের রাতেও এই দোয়া পাঠ করেছিলেন।

সাহরাসূলুল্লাহর উত্তরে হযরত আলী (রাঃ) বললেন হ্যাঁ। আমি ঐতিহাসিক সিফফিনের যুদ্ধের রাত্রে এই দোয়া পাঠ করেছিলাম।

কষ্ট ও সহিষ্ণুতার মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) আনাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় পার্থিব জীবনে কষ্ট ও সাধনার এক চূড়ান্ত আদর্শ মহিলা ছিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) আনহার স্বামীর গৃহে কোন দিন ভোগ বিলাস ও পার্থিব শান শওকতের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। জন্ম হতে ১৪ বছর পর্যন্ত পিতা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোলে লালিত পালিত হলেন। রাসূলুল্লাহ গৃহে কোন দিন পার্থিব আরাম আয়েশে দিন কাটাতে পারেন নি। বরং কষ্ট সাধনা ও সহিষ্ণুতার উত্তম শিক্ষা পেয়েছেন হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কিছু দিন পরে হযরত ফাতেমা (রাঃ) স্বামী গৃহে চলে যান।

হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন, অত্যধিক গরিব। যার কারণে বিবাহের পরে নতুন সংসার করলেও তার গৃহে কোন আসবাব পত্র ছিল না। হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) পিতার গৃহ হতে স্বামীর গৃহে আসার সময় উপহার স্বরূপ যে আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে একটি জিনিসও হযরত আলী (রাঃ) বাড়াতে পারেন নি।

হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) তাঁর জীবনে কত যে কষ্ট করেছেন তার তুলনায় আমাদের কষ্ট কোন বড় ধরনের কষ্টের মধ্যে পড়ে না। মানুষ সাধারণ দেখা যায় স্বামীর গৃহে স্বাধীনভাবে বসবাস করে একটু সুখ শান্তি উপভোগ করে। সেই সুখের স্বামীর গৃহেও হযরত ফাতেমা (রাঃ) যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর হাতে ফোসকা বা ফোড় পড়ে গিয়েছিল। শুনলে দুঃখ লাগে রাসূলুল্লাহ দুলালী কত কষ্টের মধ্যে দিয়ে স্বামীর সংসার করেছেন, এমনও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, স্বামীগৃহে গায়ে জড়ানোর মতো মাত্র একটি চাদর ছিল। সেই চাদর এত খাট ছিল যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকতে গেলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকতে গেলে মাথা বেরিয়ে যেত। জীবিকার অবস্থা এতই করুন ছিল যা শুনলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অন্তর কেঁপে ওঠে। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামীর গৃহে কখন সারা সপ্তাহে চুলায় আগুন

জ্বলত না। এমনও দেখা গেছে ক্ষুধা নিবারণের জন্যেও গৃহে কিছু না থাকলে ক্ষুধায় বেশি কাতর হলে পেটে পাথর বেঁধে দিতেন।

একবার হযরত আলী (রাঃ) জীবিকা অন্বেষণের জন্যে ঘর হতে বের হয়ে মদীনার উপকণ্ঠে গেলেন। তথায় যেয়ে দেখতে পেলেন জনৈক বৃদ্ধা সামান্য ইট পাথর জমান করে বসে আছে। রাসূলুল্লাহ জামাতা হযরত আলী (রাঃ) বৃদ্ধাকে দেখে মনে মনে ভাবছে হযতবা বৃদ্ধা তার বাগানে পানি সিঞ্চন করতে চায়। সত্যি, তার ভাবনা ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে পরিশ্রমিক ঠিক করে পানি উঠিয়ে সিঞ্চন করতে রাগলেন, কিন্তু পানি উঠাতে উঠাতে তার শরীর একেবারে দুর্বল হয়ে গেল শুধু দুর্বল নয় তার হাতে ফোসকা পড়ে গেল। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পারিশ্রমিক হিসেবে পেলেনমাত্র এক মুঠো খেজুর। মনের খুশীতে এক মুঠো খেজুর নিয়ে বাড়ি ফিরে প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত ফাতেমা হাতে তুলে দিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর দুনিয়া জীবনের নিয়ামতের মধ্যে সর্বোত্তম নিয়ামত ছিল মোটা কাপড় ও মোটা রুটি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) শত কষ্ট ক্লেশের মধ্যে জীবন যাপন করে কোন দিনই কার কাছে কষ্টের কথা বলতেন না বরং অধিক অভাব অনটনের মধ্যেও সবর করতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামীর গৃহের অবস্থা

রাসুলূল্লাহ (সাঃ)-এর জামাতা শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)-এর আর্থিক অবস্থা যে করুন ছিল তা পুর্বে আলোচন্না হয়েছে। তার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ বলতে কিছু ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) নিজে তার আর্থিক অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) সাথে আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার অবস্থা এমনি ছিল যে কেবলমাত্র একখানা ছেড়া চামড়া ছিল সেই চামড়ার ওপর উটকে খাওয়াতাম এবং রাতে ঐ চামড়া বিছিয়ে শয়ন করতাম।

অন্য এক বর্ণনা হতে জানা যায় কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাসূলুল্লাহ দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে যেয়ে দেখেন ফাতেমা (রাঃ) উটের চামড়া পড়ে আছে। যেই চামড়ার মধ্যে ছিল ১৩টি তালি। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) আটা পিষছিলেন এবং বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বাণী পড়ছিলেন। আদরের কন্যার

এমন কষ্ট দেখে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মনে কোন কষ্ট নিলেন না। মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফাতেমা, ধৈর্যের মাধ্যমে পার্থিব জগহের সকল কষ্ট শেষ কর এবং আখিরাতের স্থায়ী শান্তি ও খুশীর প্রহর গুনতে থাক। রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে উত্তম পুরষ্কার দেবেন।

এক সময় হযরত আলী (রাঃ) অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘরে এসে খাবার চাইলেন। খাবার চাওয়ার সাথে সাথে হযরত ফাতেমা (রাঃ) আদাবের সাথে নম্র কণ্ঠে বললেন, হে প্রাণ প্রিয় স্বামী আজ তিন দিন পর্যন্ত অভুক্ত আছি। আপনার ঘরে খাবার মতো একটি যবের দানাও নেই। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মুখের কথা শুনে হযরত আলী বললেন, হে ফাতেমা (রাঃ) তুমি আমাকে একথা কেন জানাও নি? স্বামীর কথার জবাবে হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন, বিবাহের সময় আমার আব্বা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নসীহত স্বরূপ বলেছিলেন, আমি কোন সময় যেন সওয়াল করে আপনাকে লজ্জিত না করি।

প্রখ্যাত বিপ্লবী সাহরাসূলুল্লাহ হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে হযরত আলী (রাঃ) কে ডাকতে পাঠালেন। আমি তাকে ডাকার জন্যে তাঁর গৃহে পৌঁছলাম তখন আমি দেখতে পেলাম হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে কোলে নিয়ে যাতা পিষছেন।

প্রখ্যাত মোহদ্দিস জামালুদ্দীন বণৃনা করেছেন, কোন এক সময় হযরত ফাতেমা (রাঃ) মসজিদে নব্বীতে তাশরীফ নিলেন এবং রুটির ছোট ছোট টুকরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তখন ফাতেমা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই রুটির ছোট টুকরাটি কোথায় পেলে? তখন জবাবে হযরত ফাতেমা (রাঃ) নম্র কণ্ঠে বললেন, আব্বাজান, অল্প কিছু যব পিষে রুটি বানিয়ে ছিলাম। আমাদের মুখে যখন তুলেদিলাম তখন আপনার কথা মনে পড়ায় আপনার জন্যে সামান্য কিছু রেখে দিয়েছি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তৃতীয় বেলা অনাহারে থাকার পর ভাগ্যে এ রুটিটুকু মিলেছে। মেয়ে ফাতেমা (রাঃ) দেয়া রুটি খেলেন এবং বললেন, চার বেলা অনাহারে থাকার পর আজ তোমাদের রুটির টুকরাটি মুখে দিলাম।

দু'জনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) অভাব অনটনের সংসারে দাম্পত্য জীবন কাটালেও তাদের সম্পর্ক ছিল মধুর। তাদের সম্পর্কের মধ্যে দারিদ্র্যের কষাঘাত ফাটল ধরাতে পারেনি; বরং তারা অভাব অনটন ও শত কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করে, প্রকৃত দাম্পত্য সুখ এবং মানসিক শান্তি পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে দিলেন। তারা তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি পদে পদে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র সুখের বাণী ও উপদেশগুলো স্মরণ করে জীবনের সকল কার্য সম্পন্ন করতেন। যার কারণে দেখা গেছে শত কষ্ট অভাব অনটন তাদেরকে তাদের রাসূল প্রদত্ত আদর্শ হতে এক মুহূর্তের জন্যেও হটাতে পারেনি।

তাদের উত্তম চরিত্র, মহৎ গুণ, সহিষ্ণুতা, অল্পে তুষ্টি, ধৈর্য সহ্য ছিল প্রধান স্বভাব। সত্যি তারা প্রিয়রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আদর্শকে সামনে রেখে পার্থিব জগতের সুখ শান্তি আরাম আয়েশ উপেক্ষা করে পরকালীন স্থায়ী সুখ শান্তির প্রত্যাশায় অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টের সংসারটিকে প্রগাদ ভালবাসা ও মায়া মমতার বন্ধনে বেহেশতে পরিণত করেছিল।

শিক্ষা দীক্ষা, বংশে গৌরবে সকল সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে ইসলামের বীর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন সকলের শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু কোন সময় তিনি রাসূলুল্লাহজির কন্যা বিবি ফাতেমার (রাঃ) সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না বরং বিনম্র ব্যবহার করতেন। সত্য অপ্রিয় হলেও হয় দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের সংসার টুকি-টাকি ব্যাপারে কোন সময় হযরত আলীর (রাঃ) মন মানুসিক খারাপ হলে মনকে এভাবে শান্ত্বনা দিতেন যে রাসূলুল্লাহ কন্যার সাথে খারাপ ব্যবহার করা মানে হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর খারাপ ব্যবহার করা।

হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) কত উন্নত মহৎ আদর্শ নিয়ে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) গৃহে এসে সাংসারিক জীবনের কোন ব্যাপার নিয়ে মানুসিক খারাপ করার সাথে সাথে পিত্রালয় হতে স্বামী গৃহে আসার সময় রাসুলূল্লাহ (সাঃ) যে কথাটি বলেছিলেন, তা হৃদয়ের মাঝে স্থান দেয়। হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে আলী গৃহে বিদায় দেওয়ার সময় আবেগ জড়ান কণ্ঠে বলেছিলেন 'মা' মনে রাখবে স্বামীর সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি।

হযরত আলী (রাঃ) অভাব অনটনের সংসারে হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রিয়তমা স্ত্রী জীবন সঙ্গিনী হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে ভাল বাসতেন শুধু ভাল বাসাই নয় বাস্তবেও তার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেনি। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহজির কালিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) অভাব অনটনের সংসারে জীবন যাপন করেছেন বটে কিন্তু কোন সময় স্বামী হযরত আলীর (রাঃ) সাথে রূঢ় ব্যবহার করেনি, যাতে তার মনে কষ্ট পায় বরং তার মধু মাখা ব্যবহার ও আচরণের মাধ্যমে তার হৃদয়ের মনি কোঠায় স্থান পেয়েছিল।

হযরত আলী (রাঃ) নিজেই বলেছেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) অভাব অনটনের সংসারে জীবন যাপন করে স্বামীর প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। যে ভালবাসার মধ্যে কোন স্বার্থ লুকায়িত ছিল না। সকল স্বার্থের উর্ধ্বেই ছিলাম আমি। শুধু ভালবাসা নয় স্বামীর অভাব অনটনের সংসারের প্রতি লক্ষ্য করে নিজের সকল চাহিদা পরিত্যাগ করে কষ্টকে বরণ করে নিয়েছেন। অত্যধিক প্রয়োজনীয় জিনিসের আবদার করে স্বামীকে বিপদগ্রস্থ করেন নি।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) স্বামীগৃহের সকল কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। অনেক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা হিসেবে অনেকেই সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে চাইতেন। কিন্তু ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদরের দুলালী পবিত্র মুখ হতে বের হয়ে আসত "নিজের হাতে স্বামী গৃহের কাজ সম্পন্ন করার মধ্যে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজ হাতে স্বামী গৃহের কাজ করতেন, তা একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) নিজে বলেন, কোন এক রাত্রে হযরত ফাতেমা (রাঃ) হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থতা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ছিল যে অযু করে নামায আদায় করাও বিপদ মনে হত। কিন্তু ঐ সময় তাইয়াম্মুমের প্রথা প্রচলত হয়নি। যাইহোক শত কষ্টের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) অযু করে ফজরের নামায পড়লেন। আমি জামাতে ফজরের নামায আদায় করার জন্যে মসজিদে রওয়ানা হলাম। মসজিদ হতে এসেই দেখতে পেলাম অসুস্থ ফাতেমা, বসে বসে যাতায় আটা ভাঙ্গতেছেন। তার এমন দৃশ্য দেখে আমার চোখে পানি

এসে গেল, আমি ফাতেমা (রাঃ)-এর মাথায় হাত রেখে বললাম, হে ফাতেমা, তুমি অসুস্থতা নিয়ে যাতায় আটা ভাঙ্গতে শুরু করলে কেন? অসুস্থ ফাতেমা, মুচকী হাসি দিয়ে বললেন, হে স্বামী! আপনার খুশীতে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার খুশী বিধায় শত কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন করে, আপনার খেদমত করে, আমি আত্মতৃপ্তি পাই।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মুখের কথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যার আমলও রাসূলুল্লাহর মত। অন্য এক বর্ণনা হতে জানা যায় হযরত ইমাম হাসান, হোসাইন জন্ম গ্রহণ করেছেন। হোসাইন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কোলে অর্থাৎ দুগ্ধ পোষ্য শিশু। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ দুলালী হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) যাতায় আটা পিষতে শুরু করেছেন। এমনি মুহূর্তে হঠাৎ শায়িত হোসেন দুধের জন্যে কেঁদে উঠলেন। হযরত আলী (রাঃ) হোসেনকে কোলে নিয়ে আদর করে চুমু খেয়েও কান্না থামাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত হযরত ফাতেমা (রাঃ) ক্রন্দনরত হোসেনকে কোলে নিয়ে অতি কষ্ট করে যাতা ঘুরাতে লাগলেন। আর ঐ সময় যাতা না ঘুরায়ে উপায় নেই। যেহেতু স্বামী হযরত আলী (রাঃ) কাজের লক্ষ্যে বাইরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু বাইরে যাবার সময় হযরত ফাতেমার (রাঃ) এমন কষ্ট দেখে হযরত আলীর অন্তরে খুব দুঃখ পেলেন, আর দুঃখ পাওয়ারই কথা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার গৃহে এসে অবিরাম কষ্টই করেছে। যাইহোক হযরত আলী (রাঃ) গৃহ হতে বের হওয়ার সময় তার পবিত্র চেহারায় বেদনার্ত দৃশ্য দেখে ফাতেমা (রাঃ) খুবই কষ্ট পেলেন। সে মনে মনে ভাবতেছে হয়তো বা স্বামী আমার ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) কাজ শেষে গৃহে ফিরে এলেন।

সারা দিনে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের শেষে বিশ্রামের পরে হযরত ফতেমা (রাঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) প্রেম ভালবাসা নিবেদন করে বিনয়ী কণ্ঠে বললেন, হে স্বামী! বাইরে যাবার মুহূর্তে আপনার চেহারা এভাবে বিষন্ন দেখান কেন, এর কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না জানতে পারব ততক্ষণ আমার মনে শান্তি ফিরে আসবে না। আপনি মনে মনে ভাবতেছেন যে আপনার মলিন চেহারা দেখলে আমি মনে কোন কষ্ট পাইনা। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর হৃদয়গ্রাহী ভালবাসার পরশমূলক কথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তেমন কিছু নহে, তবে গৃহ হতে বের হবার সময় শিশু

কোলে নিয়ে যাতা ঘুরানোর দৃশ্য দেখে আমার মনে খুব দুঃখ লেগেছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, স্বামী গৃহের শত কষ্টের বিনিময়ে নারী জীবনের অমূল্য রত্ন, স্বামীর মুখে এক বিন্দু হাসির ঝলক ফুটানো যায় তার মধ্যেই আমি শান্তির অমীয় সুধা খুঁজে পাই। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা হল স্বামীর খুশীতে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তায়ালা খুশী। যেই পালনকর্তা আমাকে ও আপনাকে সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সত্যি, আদর্শের প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পবিত্র মুখের পবিত্র কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জামাতা হযরত আলীর (রাঃ) দু'চক্ষু দিয়ে মনের অজান্তেই আনন্দশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দাম্পত্য জীবনের মিলন মোহনায় সাংসারিক টুকি-টাকী নিয়ে এক আধটু মনোমালিন্য ঘটেনি তা নয়। আর এটা ঘটা স্বাভাবিক, যেহেতু মানুষ ফেরেশতা নয়। মানুষের চলার পথে টুকি-টাকি ভুল ভ্রান্তি ঘটবেই আর তা না ঘটলে মানুষ নামের স্বার্থকতা হত না। মানুষ হিসেবে দাম্পত্য জীবনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে দু'এক সময় মনো মালিন্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের এমন মনো মালিন্যকে সময় সীমাতিক্রম করতে পারেনি, কিছু সময়ের মধ্যে তা সমাধান হয়ে ভালবাসার হাতকে প্রসারিত করেছে।

এক বর্ণনা হতে জানা যায় কোন এক দিন হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে কোন ব্যাপার নিয়ে কথোপকথন চলছিল, এমন সময় হঠাৎ করে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মুখ হতে একটি কড়া বাক্য বের হল। ফাতেমা (রাঃ)-এর মুখ হতে এমন কড়া বাক্য শ্রবণে হযরত আলী (রাঃ) একটু ব্যথিত হলেন। যার কাছ হতে সর্বদাই সম্মান ও ভালবাসা মূলক আচরণ পেয়ে থাকে, তার মুখ হতে এধরনের বাক্য বের হওয়ায় দুঃখ পাবারই কথা। যাইহোক হযরত আলী (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর সাথে অভিমান করে তাকে কোন কিছু না বলে গৃহ হতে বের হয়ে পড়লেন। এমনকি রাতেও গৃহে ফিরে আসেনি। তাদের এমন মনমালিন্যের কথা প্রিয় নবী (সাঃ)-এর কানে গেল। আল্লাহর নবী (সাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) খোঁজে বের হলেন, খোঁজতে খোঁজতে হঠাৎ দেখলেন নবী (সাঃ)-এর

জামাতা হযরত আলী (রাঃ) ফরাশ বিহীন মসজিদে ধুলাবালির মধ্যে শুয়ে আছেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) তাকে এহেন অবস্থায় দেখে "হে আবু তুরাব" (ধুলাবালির জনক) বলে ডেকে উঠালেন এবং বললেন, অতি শীঘ্রই গৃহে চল। আল্লাহ নবীর (সাঃ) নির্দেশে হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাথে গৃহে চললেন, এর পরে রাসূলে (সাঃ) উভয়কে নসীহত করে উভয়ের মধ্যেকার মনোবিবাদ মিটায়ে দিয়ে বললেন, তোমরা সুখে থাক।

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় একদা কোন এক ব্যাপারে নবী (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রতি কষ্ট হয়ে এমন এক কাজ করে বসলেন। যাতে নবী করিম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গৃহত্যাগ করলেন। কেবল গৃহ ত্যাগ করলেন তা নয়। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলেন। হযরত ফাতেমার (রাঃ) সাথে সাথে হযরত আলী (রাঃ) ও অবনত মস্তকে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সম্মুখে বসে রইলেন। নবী হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) সামনেই বসে রইলেন। আর হযরত ফাতেমা (রাঃ) আলীর (রাঃ) সামনে তার বিরু পিতার কাছে অভিযোগ করলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কথা শ্রবণ করে হযরত আলী (রাঃ)-কে কোন কিছু জিজ্ঞে করেই ফাতেমার দিকে চেয়ে বললেন, হে ফাতেমা (রাঃ) সকল ক্ষেত্রে যে হযরত আলী (রাঃ) তোমার মন যোগায়ে চলবে এটা হতে পারে তোমারও ধৈর্য ধারণ করে চলা উচিত। পিতা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কোন কিছু বললেন না। তবে নিজের বুঝতে পেরে রজ্জিত হয়ে স্বামীর গৃহে চলে গেলেন।

উল্লেখ্য যে উক্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কেই শিক্ষা দিলেন এ কথা ঠিক নয়। তবে পিতার কথার মাধ্যমে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অনুধাবন করতে পারলেন, যে সামান্য ছোটখাট বিষয় নিয়ে পিতার কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসা মোটেই ঠিক হয়নি। তবে এ সামান্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে হযরত আলী (রাঃ) ও যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছিলেন এ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) নিজে বলেছেন যে আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ফাতেমার ভুল শোধরে দিয়েছেন একথা সত্য যে আমার মধ্যেও এভাব সৃষ্টি

প্রকৃতপক্ষে আমিই অপরাধ করেছি, ফাতেমা (রাঃ)-এর সাথে যদি আমি এমনি ধরনের ব্যবহার না করতাম, তা হলে ফাতেমা (রাঃ) কোন ক্রমেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসত না এবং তিনি পিতার নিকট লজ্জিতও হত না। এ ব্যাপারে আমি অনেক দুঃখ পেলাম।

তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আল্লাহ যে কয়দিন দুনিয়ায় বাচাবে কোন সময়ই নবী (সাঃ)-এর দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর হৃদয়ে কষ্ট দেব না। এভাবে দম্পতি যুগলের মন পরিষ্কার হয়ে আন্তরিকতা ও ভালবাসার পথ সুগম হল। নবী (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) জীবিত থাকাকালীন হযরত আলী (রাঃ) বিবাহ সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ইতিহাস বেত্তারা এভাবে লিখেন যে নবী (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) বিবাহ করে নবী দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ভয়ে তার বাসগৃহে না এনে অন্য এক স্থানে স্ত্রীকে রেখে দিয়েছেন। তবে ইতিহাস বেত্তাদের এমন উক্তির কোন সত্যতা নেই। মূল ঘটনা বর্ণনা সাপেক্ষে বলা যেতে পারে যে কোন সময় কুরাইশ প্রধান আবু জেহেলের কন্যার সাথে হযরত আলীর (রাঃ) বিবাহের ব্যাপারে এক প্রস্তাব উঠেছিল এবং সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কন্যা পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট অনুমতি চেয়ে প্রার্থনা করা হল- আল্লাহর নবী (সাঃ) তাতে খুবেই বেজার হলেন আর বেজার হওয়ার কথাও যেহেতু হযরত ফাতেমা (রাঃ) আলী গৃহেই আছেন, আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আগন্তুক লোকটিকে বলে দিলেন তোমার দেওয়া প্রস্তাবটি যেমনি অসঙ্গত তেমনি ভাবনীয় বিষয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আগন্তুক লোকটির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বললেন, আল্লাহর নবীর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং আল্লাহ তায়ালার দুশমনের কন্যা একই বাসগৃহে কোন অবস্থাতেই বসবাস করতে পারে না। সর্বদা একথা স্মরণ রাখবে, আমার কন্যা ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা বিধায় তার যে কোন কষ্ট আমার কষ্ট ও দুঃখ লাগে। আল্লাহর নবী (সাঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমন হৃদয় গ্রাহী কথা ও ঘোষণা হযরত আলীর (রাঃ) কানে পৌছল। হযরত আলী (রাঃ) এই দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে কোন মতই প্রদান করেন নি। তবে এ কথা সর্বজন সত্য কথা যে নবী দুলালী হযরত ফাতেমার (রাঃ) জীবিত থাকা অবস্থায় নবী জামাতা হযরত আলী (রাঃ)

দ্বিতীয় বিবাহের চিন্তাভাবনাই করেনি। কেননা হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আচার আচরণে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই দ্বিতীয় বিবাহের চিন্তা ভাবনা করতে পারেন নি।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক

হযরত ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে অনেকে এ ধরনের একটি কথা উপস্থাপন করেন যে, হযরত ফাতেমা সাইয়্যেদুল মুরসালীন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নয়নের মনি ও কলিজার টুকরা এবং শেরে খোদা ইসলামের বীর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং ইমাম হাসান হোসাইনের মাতা বলেই পৃথিবীতে তিনি এত সমাদৃত এ প্রসিদ্ধি এবং চির শান্তিময় বেহেস্তের রমণীদের নেতা হওয়ার উল্লেখ যোগ্য কারণ এখানে।

প্রকৃতপক্ষে যারা এ সমস্ত মত পরিবেশন করেন তাদের এ ধারনাটি কোন ক্রমেই ঠিক না। তবে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা, হযরত আলীর (রাঃ)-এর স্ত্রী, ইমাম হাসান হোসেনের মা হতে পেরে হযরত পাতেমা (রাঃ) বিশ্ব নন্দিত ও ভাগ্যবতী নারী হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছেন, একথা সর্বজন স্বীকৃত। তবে তিনি যে উত্তম চরিত্র ও বিভিন্ন গুণাবলীতেই নারী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও মহিয়সী নারী হিসেবে ভুবন জোড়া সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করে ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন একথা দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জল।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সত্য ভাষণ

সততা মানুষকে সুন্দর জীবন যাপনের পথ বের করে দেয়, তাই একথা নিশ্চিত সত্য যে, সত্যই সুন্দর সততা মানুষকে পূত পবিত্র জীবন যাপনের পথকে সুগম করে দেয়। আর এই সত্যকে পার্থিব জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। এই সত্যের ধারক বাহক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) গোটা জীবন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সত্যের দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুজ জহুরা (রাঃ)-এর গোটা জীবন নিখুৎ সত্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সাংসারিক জীবনের অভাব অনটনের মধ্যে তিনি সত্যপথ হতে এক মুহূর্তের জন্যে সরে পড়েনি বরঙ সত্যের ওপর দৃঢ় পদে অটল ছিলেন তিনি

জন্মের পর যখন থেকে তার জ্ঞান লাভ হয়েছে তখন হতে মৃত্যু পর্যন্ত কোন অবস্থায় কার সাথে মিথ্যা কথা বলেনি। শুনলে বাক লাগে হযরত আলী (রাঃ)-এর গৃহে যেয়ে কারণে অকারণে কোন সময়ই আলী (রাঃ)-এর সাথে মিথ্যা কথা বলেনি।

সাধারণত দেখা যায় মানব সন্তান স্বামীর গৃহে বসে স্বামীর সাথে ছলেবলে অনেক সময়ই স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। কিন্তু ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল তিনি কোন সময়ই হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে মিথ্যা বলেন নি, সাংসারিক জীবনেও কোন সময় মিথ্যা কথা বলে নি, বরং সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখের মুহূর্তেও তার মুখ হতে মিথ্যা কথা বের হয়ে আসেনি। সত্য ভাষণকে তিনি তার জীবনের প্রধান নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে ছিলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নিরহংকারিতা ও নম্রতা

যারা আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জন হিসেবে অভিহিত হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই জীবন চলার প্রতিটি পদে বিনয় ও নম্রতার মহৎ গুণটি প্রতিফলিত করেছেন। কোন সময় নিজের মধ্যেকার গুণ গরিমার জন্যে অহংকার করে নিজেকে জাহের করতে চাননি। নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমাতুজ জোহুরা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী, ইমাম হাসান হোসেনের মা হিসেবে আত্ম গরিমা করে নিজেকে বড় করে দেখেনি বরং সাধারণ নারী হিসেবে সকলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে চলতেন। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে বর্তমান যুগের মানব সন্তানের মত নিজেকে সমসাময়িক রমণীগণ হতে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে পারতেন। কিন্তু নারী কুলের শিরমণি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা; তিনি বিনয় ও নম্রতার দ্বারা ছোট বড় সকলের নিকট আপনজন হিসেবে গৃহীত হয়েছিলেন।

তার কথা ও কাজে অহংকারের লেশ মাত্র ছিলনা। তিনি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা সকলের শীর্ষে তার স্থান, এমনি কথা তার হৃদয়ে মাঝে সবসময় ভেসে উঠেনি বরং তার হৃদয়ের মধ্যে সর্বদা একথাই লুকায়িত থাকত যে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা আমার দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে অনেক কিন্তু আমার দ্বারা তা পালিত হচ্ছে না, ভয় হচ্ছে, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব অথচ নবী কন্যা হিসেবে সত্য ধর্ম

ইসলামের বাণী প্রচারের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে মোটে কার্পণ্য করেনি তারপরও সর্বদা দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করতেন। পরিশেষে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে হযরত ফতেমা (রাঃ) এর জীবনে মহৎ গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ গুণ ছিল বিনয় ও নম্রতা, আত্ম গরিমা কোন ক্ষেত্রেই স্থান পেতনা।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামীর সেবা

হযরত ফাতেমাতুজ জহুরা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর, স্বামী গৃহে আসার বিদায় মুহূর্তে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে উপদেশটি দিয়েছিলেন তা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে পিতৃগৃহ হতে বিদায়ের সময় হযরত আলী (রাঃ) সামনে বল্লেন "হে ফাতেমা, দাম্পত্য জীবনে প্রতি মুহূর্তেই স্বামীকে সম্মান করবে ও শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে ভালবাসবে কেননা স্বামীর খুশীতে আল্লাহ খুশী যার কারণে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা দাম্পত্য জীবনে স্বামীর সেবাকে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির মূল চাবিকাঠি বলে মনে করতেন ইতঃপূর্বে অনেক স্থানেই হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামী সেবার অমর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। যে ঘোষণা বিশ্বের সকল মুসলিম নারীদের জন্যে পথনির্দেশিকা হয়ে থাকবে। হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা যতদিন দুনিয়ায় বেঁচেছিলেন স্বামীর সেবা ও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের সমাজে যদি হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মত স্বামীভক্ত, স্বামীসেবা, গুণগুলি বিরাজ করত তাহলে প্রত্যেকটি মুসলিম পরিবারই শান্তির নিকেতন হতে যেত। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই আসুন, আমরা সকলেই আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে হযরত ফাতেমাতুজ জোহরার (রাঃ) আদর্শে জীবন গঠন করি

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কষ্ট ও ত্যাগ

সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় কারো জীবনে সুখ নামক পাখিটি হাতের নাগালে আসেনা, আর কারো জীবনে সুখের পাখিটি হাতের গন্ডির মধ্যে উড়ে বেড়ায়। তাই এ কথা নিশ্চিত সত্য যে

প্রত্যেকের জীবনে কম বেশি কষ্ট থাকে। যারা পার্থিব জীবনের সুখ শান্তিকে তুচ্ছ মনে করে, পরকালীন সুখকে স্থায়ী সুখ মনের করে, তাদের জীবন কত ঘাত প্রতিঘাত ও কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয় তা লিখনির মাধ্যমে প্রকাম করা সম্ভব নয়। যার জলন্ত প্রমাণ হল খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ)। সুখের ভবন স্বামী গৃহে এসে কত যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। জীবন দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ, অভাব-অনটনের, মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, জন্মের পর হতে দুঃখ কষ্টের অগ্রযাত্রা শুরু হলে স্বামীর গৃহে এসেও সুখ করতে পারেনি। বরং স্বামী গৃহে অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হলে পলকের তালে তার চেহারাখানি মলিন হয়নি।

কোন সময় স্বামী গৃহের দুঃখ-কষ্টের কথা পিতার নিকট, স্বামীর নিকট মুখ খুলে বলেনি, বরং সকল কষ্টই নীরবে ধৈর্যধারণ করতেন। এমন কি নামাযান্তে ও প্রার্থনার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্টের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন অভিযোগ পেম করেনি। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কষ্ট সহিষ্ণুতা কথা ইতঃপূর্বে বহু স্থানে আলোচিত হয়েছে।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর লজ্জা-সম্ভ্রম

লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখের বাণীটি তাঁর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) তাঁর জীবনের প্রতিটি পদে সত্যিকারভাবে গ্রহণ করে রাসূলের আদর্শে জীবন গঠন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। লজ্জা নারীর ভূষণ, তবে এ প্রবাদ বাক্যটি মনে হয়, হযরত ফাতেমার (রাঃ) জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল। তবে বর্তমান যুগের আধুনিক নারীগণ এতো সুন্দর বাক্যটিকে অনেকেই ইচ্ছা করে ত্যাগ করে খোলা মেলা চলাফেরা কে ফ্যাশনের মধ্যে গণ্য করেন। কিন্তু আদুনিক নারীগণের উচিত সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে মা ফাতেমার মত লজ্জাশীল হওয়া। তাহলে তাদের সর্বক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

আলোচ্য বর্ণনায় হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবনের দু-একটি লজ্জার

কাহিনী তুলে ধরব, যা করে বর্তমান যুগের আধুনিক নারীগণ তাদের ভ্রান্ত স্বভাব পরিত্যাগ করে, খোদায়ী জীবন যাপনে নিজেদেরকে উজাড় করে দেবে। বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে কেহ কি বলতে পার যে স্ত্রী লোকের সর্বোত্তম বস্তু কোন জিনিস? উপস্থিত সাহাবীগণের কেহই প্রিয় নবী (সাঃ) এর প্রশ্নের সঠিক জবাবা দিতে পারেনি, ঐ সভায় শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার গৃহে এসে সর্ব প্রথম ফাতেমা (রাঃ) এর কাছে রাসূলূল্লাহ (সাঃ) এ কথাটি প্রকাশ করলেন। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর কাছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এ কথাটি প্রকাশ করলেন। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন, আপনি কেন একথা বলেনি যে, "লজ্জা বশতঃ স্ত্রী লোকের ভিন্ন পুরুষ কে না দেখা এবং নিজেকে কোন ভিন্ন পুরুষকে দেখতে না দেওয়া। ইহাই হল স্ত্রীলোকের জন্যে সর্বোত্তম বস্তু।" হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মুখ হতে এমন জবাব শুনে হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উক্ত জবাবটি দিলেন। হযরত আলীর (রাঃ) মুখে এহেন জবাব শুনে প্রিয় নবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ জবাব কোথা হতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনা মাত্রই অত্যধিক খুশি হয়ে বললেন, আমার কলিজার টুকরা মা ফাতেমা (রাঃ) আমার মেয়ে বলে তার দ্বারা সঠিক জবাবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অন্য এক বর্ণনা হতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক সময় তার কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জন্যে একটি অল্প বয়স্ক চাকরি নিয়ে তার গৃহে হাজির হলেন। ঐ মুহূর্তে হযরত ফাতেমা (রাঃ) শরীরে এমন একখানা খাট কাপড় ছিল, যা দ্বারা মাথা ঢাকলে পা উন্মুক্ত হয়ে যেত আবার পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু নবীর (সাঃ) আগমনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ঐ কাপড়খানা দ্বারা সর্বাঙ্গ ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ মেয়ের এমন দৃশ্য দেখে বললেন মা তুমি এমন করতেছ কেন তোমার গৃহে তোমার পিতা ও একটি নাবালক ছেলে ছাড়া আর কেহ উপস্থিত নেই। অন্য এক হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হযরত ফাতেমাতুজ জোহুরা (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন।

এমনি সময় হঠাৎ সেখানে কোন এক বিশেষ কাজে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামক জনৈক সাহাবী প্রবেম করলেন। উম্মে মাকতুম আসা

মাত্র হযরত ফাতেমা (রাঃ) অত্রন্ত ব্যস্ত হয়ে সেখান হতে অন্যত্র চলে গেলেন। আবদুল্লাহ্ চলে যাবার পরে তথায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাতেমা (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, অন্ধ লোকটি আগমনের কারণে তোমার অন্যত্র যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিলনা। প্রিয় নবী (সাঃ) এর জবাবে হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হে নবী (সাঃ) তিনি অন্ধ বলে আমাকে দেখতে পায়না অথচ আমিতো অন্ধ। আমি অবশ্যই তাকে দেখতে পাচ্ছি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে যখন নিশ্চিত ধারণা করতে পারলেন যে তার মৃত্যু খুবই কাছে। তখন তার মনের মধ্যে কেবল একটি চিন্তা দোলা যাচ্ছিল, তিনি মৃত্যুর পাশাপাশি একথাও ভাবতেন, তার মৃত্যুর পরে তার মৃত লাভ যেন কত মানুষে না দেখে? অবশ্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে পরিবারের সকলকে বলে দিয়েছেন আমার মৃত্যুর পরে আমার লাশ যেন রাতের অন্ধকারে কবরে রাখ হয় এবং আমাকে একমাত্র খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বৃদ্ধা স্ত্রী আসমা ছাড়া অন্য কেহ গোসল না করায়। আর আমাকে গোসল দেওয়ার সময় কেহই যেন কাছে না থাকে প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ তিনি কতটুকু লজ্জাবতী ছিলেন, একটু ভেবে দেখুন।

জীবিত কালের কথা তো চিন্তাই করা যায় না। দুনিয়া থেকে চলে যাবার পরে তার লাশ লোকজনে দেখে ফেলে কিনা এ চিন্তায় দিন রাত হতাশার মধ্যে কেটে দিয়েছেন তবে যেমনিভাবে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করে আল্লাহ তায়ালাও তার মনের ঐ কান্তিক কামনা কবুল করে নিয়ে সেভাবেই জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দেন। তদ্রূপ হযরত ফাতেমা (রাঃ) দুনিয়ার জীবনেও তার পরের জীবনে যেমনিভাবে নিষ্পাপ নিখুঁত থাকতে চেয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা তেমনিভাবে তার মনের মাকছুদ পুরা করেন।

হাদীস শরীফের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় হাশরের কঠিন মসীবতের দিন এ লজ্জার প্রতিমা নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) যখন পুলছিরাত পার হয়ে চির শান্তিময় বেহেশতের দিকে রওয়ানা করবেন তখন বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দেশে একজন ফেরেশতা আওয়াজ দিয়ে বলতে থাকবে, তোমরা সকলে এখন অবনত হয়ে চক্ষু মদিত কর। কেননা এই মুহূর্তে নবীয়ে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদরের কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ)।

হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)-এর দানশীলতা

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন ত্যাগ ও দানের সম্রাজ্ঞী। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি তাকালে দেখা যায়, তিনি ত্যাগের মধ্যে দিয়ে শান্তির পথ বেছে নিয়েছেন ত্যাগ ও দানশীলতার মধ্যে দিয়ে তিনি তার মনজিল মকসুদে পৌছবেন।

তবে এ কথা বাস্ত যে, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় জনরা ভোগের মধ্যে প্রকৃত শান্তি অনুভব করেনা বরং ত্যাগের মধ্যে প্রকৃত শান্তি খুঁজে পায়। হযরত ফাতেমা (রাঃ) যে ত্যাগের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেতেন তা তাঁর জীবনের কতিপয় ঘটনার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। নিম্নে তার কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো–

হযরত নবী করীম (সাঃ) দৌহিত্র ইমাম হাসান বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের মহীয়সী জননী হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রায়ই রাত জেগে আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করতেন। আমি প্রায়ই বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতাম আমাদের আম্মাজান কান্না ভেজা কণ্ঠে বলতেন, হে রাহমানুর রাহীম আপনি আমার আব্বাজান তথা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গোনাহগার উম্মাতদেরকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল একটি মুহূর্তেও নিজের কন্যা ও আত্মীয় স্বজন ও আওলাদের কথা বলতেন না। উক্ত ঘটনার মাধ্যমে একথাই প্রমাণ বহন করে যে, তিনি ত্যাগের মধ্যে প্রকৃত শান্তি পেতেন, অন্য এক বর্ণনা হতে জানা যায় কোন এক সময় হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) তার পিতা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে কথোপকথন কালে নিজের কলিজার টুকরা দুই পুত্রের শাহাদাত স্বীকার করে নিয়ে, তার বিনিময়ে পিতা নবী মুহাম্মদের উম্মাতের মুক্তির ব্যবস্থা করে নিয়ে ছিলেন কেবল সে ত্যাগের সম্রাজ্ঞী হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তা বলা ঠিক হবে না। কেননা তিনি দানশীলতার যে অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা দেখে মানুষ অবাক হয়ে যেত। নিম্নে উহার কতিপয় ঘটনা তুলে ধরা হল–

কোন এক সময় এক অসহায় ভিখারী, নবী (সাঃ) কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহের দরজায় এসে করুনকণ্ঠে বলতেছেন, হে মা, আমাকে কিছু খাবার দিন আমি ক্ষুধার জ্বালায় আর সইতে পারছিনা। অসহায় ভিখারীর করুন আর্তনাদে মায়া মমতার প্রতিমূর্তি হযরত ফাতেমা (রাঃ) এত ব্যথিত

হলেন যে তার চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। কিন্তু ভিক্ষুককে দেওয়ার মত তার গৃহে কিছু ছিলনা। আর থাকবে কি করে সে নিজেই তো অভাব অনটনের যাতা কলে পড়ে অসহায় জীবন যাপন করেছেন। তবে তার অভাব অনটনের কথা সহজে প্রকাশ পেতনা। কেননা তিনি শত কষ্ট হলেও কারো কাছে বলতেন না, এমনকি সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াতেন না। যেহেতু তার মধ্যে পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ পূর্ণ জাগ্রত ছিল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কারো কাছে সওয়াল করা পছন্দ করতেন না।

যাইহোক ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরায়ে দিতে হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) মোটেই সম্মত হলেন না। তাই তিনি গৃহের মধ্যে দেবার মত কিছু না দেখে ইমাম হাসান হোসেন যে মেষের চামড়াটি বিছায়ে রাত্রে শয়ন করতেন তাই ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। আর দেবার সময় নম্র কণ্ঠে বললেন বাবা, তোমাকে ইহা ছাড়া আর তো কিছুই দিতে পারলাম না। তুমি অন্যত্র একটু চেষ্টা করে দেখ। ভিক্ষুক বললেন, আমার তো মা চামড়ার প্রয়োজন নেই আমার খাবার দরকার। ভিক্ষুকের এমন করুন কথা শুনে মমতার প্রতিমূর্তি হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজের গলা হতে গহনা খুলে তাকে বললেন ইহা নিয়ে বিক্রয় করে কিছু খাবার কিনে লওয়া যায় কিনা দেখ। আমি তোমাকে খেতে কিছুই দিতে পারলাম না সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দাও।

কোন এক বর্ণনা হতে একথাও জানা যায় যে, কোন এক সময় নবীজী (সাঃ)-এর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে একটি নতুন জামা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ঐ সময় তার নিকট একটি পুরাতন জামাও ছিল। ঐ মুহূর্তে হঠাৎ করে এক জনৈক ভিখারিণী এসে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট একটি জামা ভিক্ষা চাইল। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজের দুইটি জামা হতে একটি ভিখারিণীকে দান করে দেয়ার মনস্থ করে পুরাতন জামাটি নিয়ে আসলেন। হঠাৎ করে তার তার হৃদয় এমন কথাটি ভেসে উঠল যে কোন সময় কাউকে কিছু দান করলে নিজের পছন্দনীয় প্রায় জিনিসটি দান করতে হয়। আদর্শের প্রতীক মা ফাতেমা (রাঃ) হৃদয়ে এমন কথাটি ভেসে উঠা মাত্রই পুরাতন জামাটি রেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেওয়া নতুন জামাটি আগত জনৈকা ভিখারিণীকে দিয়ে দিলেন।

কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে তার এমন অপূর্ব দানের প্রতি দানে রাহমানুর

রাহীম আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে হযরত জিব্রাঈল মারফত একটি বেহেশতী রেশমী জামা পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মায়া-মমতা

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গোটা জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় তার অন্তরখানা মোমের মত কোমল ছিল। আগুনের স্পর্শে মোম যেমনিভাবে মুহূর্তের মধ্যে গলে যায় তেমনি নবী করিম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী মায়া মমতার প্রতীক বিপদাপদ বা দুঃখ দুদর্ধশা দেখা মাত্র তার হৃদয়খানা মুহূর্তের মধ্যে গলে যেত। মাতা সন্তানের প্রতি যেরূপ মমতাময় তদ্রূপ অসহায় পথহারা পথ ভোলা মানুষের জন্যে হযরত ফাতেমা ছিলেন মমতাময়ী। কেহ কোনরূপ বিপদ আপদে কিংবা দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিপিতিত মমতায়ময়ী। কেহ কোনরূপ বিপদ আপদে কিংবা দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিপিতিত হয়ে তার কাছে মাতৃজ্ঞানে ছুটে আসতেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তা মোচন করে দিতেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে ঐ মুহূর্তে তার দুঃখ কষ্ট মোচনের শক্তি সামর্থ্য নেই তবুও তিনি যথার্থ চেষ্টা করতেন। সন্তানের দুঃখ কষ্ট দেখা মাত্র মায়ের হৃদয় যেমনি বেদনার্ত হয়ে ওঠে দ্রুতই হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মতগণের দুঃখ কষ্ট দেখা মাত্র ব্যাকুল হয়ে যেতেন। যার কারণে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে সকলে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করে থাকে।

একথা সর্বজন বিদিত যে যারা আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জন হয়ে সকলের অন্তরের মাঝে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থান পেয়েছে তারা প্রতি হিংসা ও ক্রোধ হতে অন্তরকে পবিত্র রাখতেন, অর্থাৎ, প্রতি হিংসা কিংবা, ক্রোধ বলতে তাদের হৃদয়ে কোন বস্তুই ছিলনা। নবী (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ), অন্তরেও প্রতি হিংসা ও ক্রোধ স্থান পায়নি। কেহ যদি তাকে শত কষ্টও দেয় কিংবা তার সাথে অমানবিক আবরণ করে তাহলে তা সে আপনা থেকেই মার্জনা করে দিতেন। এমনকি তার দুঃখ কষ্টে বিপদে আপদে সাহায্য করার জন্যে এমনভাবে অগ্রসর হতেন মনে হত যেন সে তাদের পরিবারের একজন সদস্য। নিম্নে এ ধরনের একটি ঘটনার উপমা উপস্থাপন করা হল।

অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায় শামাউন নামক জনৈক ইয়াহুদী হযরত

ফাতেমা (রাঃ) এর প্রতিবেশী ছিল। কিন্তু লোকটি হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাছের লোক হওয়া সত্ত্বেও নবী জামাতা হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে অত্যন্ত শত্রুতা পোষণ করত। শুধু অন্তরে শত্রুতা পোষণ করতেন তা নয় বরং তাকে বিভিন্ন স্থানে হেয় প্রতিপন্ন করার কৌশল করতেন। এক কথায় শামাউল নামক জনৈক ইয়াহুদী হযরত আলী (রাঃ) কে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্যে মুসলমান হয়ে ছিলেন। কিন্তু তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে তাদের সাথে তাদের পরিবারের সকলে সম্পূর্ণ রূপে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেলল। এমন কি তার বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশীর লোকজন ও তার থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতেন। এমন পরিস্থিতিতে লোকটি নিজেদেরকে খুব অসহায় মনে করলেন। বাস্তবিকপক্ষে তারা পরিবারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে যে কষ্ট অনুভব করেছে তার চেয়ে বিপদে পড়লেন আর্থিক দিক দিয়ে। কেননা শামাউন ইয়াহুদী থাকাকালীন অনেক ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তখন ইচ্ছা অনুযায়ী টাকা পয়সা ব্যয় করতে পারতেন। ঐ লোকটির কাছে ঐ মুহূর্তে চলার মত একটি পয়সাও ছিল না। এমনি আর্থিক কষ্টের মধ্যে হঠাৎ এক দিন তার স্ত্রী পরলোক গমন করল। স্ত্রী পরলোক গমন করার সাথে সাথে মনে হল যে লোকটির মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে।

লোকটি ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল স্ত্রীকে গোসল, দাফন কারার জন্যে কোন লোক নেই। মৃত লাশ ঘরে পড়ে রইল। হযরত ফাতেমার মন মুহূর্তের মধ্যে মোমের মত গলে গেল। তিনি আর ঘরে স্থির থাকতে পারলেন না। হযরত ফাতেমা (রাঃ) দাসীর মারফত সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ওড়না দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করে বাদীকে সাথে নিয়ে নবদীক্ষিত মুসলমানের বাড়ি রওয়ানা হলেন। বাড়ি পৌঁছে নিজের হাতে ঐ লোকটিকে স্ত্রীর গোসল করায়ে অতি তাড়াতাড়ি দাফনের ব্যবস্থা করলেন একটু চিন্তা করে দেখুন ইহুদী লোকটি নবী করিম (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলীর (রাঃ) এর কতইনা শত্রুতা পোষণ করেছে। আর তার স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাঃ) স্বামীর শত্রুতার কথা মনে না করে যে মহত্বের পরিচয় দিয়েছে তা কি আমাদের ভেবে দেখা উচিত না? অথচ আমরা সেই নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমার পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত হয়ে আমাদের শত্রুদের সাথে কিরকম আচরণ করেছি। অথচ একজন মুসলামানের ঈমানী

দায়িত্ব হল ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে শত্রুদের মন জয় করা। কেননা পরবর্তী কালে শত্রু যেন তার আচরণের জন্যে আফসুস করে।

যাইহোক হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আচরণেও উত্তম ব্যবহারে ইয়াহদী মুসলমানটি বিস্মিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে ছিল। ইহুদী মুসলমান তার পূর্বের আচরণের জন্যে বার বার হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বাঁদীর মারফত তার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করল। অর্থ আদর্শের প্রতীক হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রথমে ইহুদী মুসলমানকে বলে দিয়েছিলেন আমরা তোমার প্রতি কোন রূপ আক্রোশ কিংবা ক্রোধ নেই। অনেক আগে তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু লোকটি একথা কোনভাবে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। লোকটির মুখ হতে কেবল বের হয়ে আসত আমার মত পাপীকে মনে হয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করেন নি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমার অতীতের অপরাধের জন্যে খাস করে দোয়া করেন। হয়তো বা তারই দোয়ার উসিলায় আমি পরকালে মুক্তি পাব।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ইবাদত বন্দেগীর নমুনা

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গোটা জীবনের ইবাদত বন্দেগীর যে দৃশ্য আমরা অবলোকন করি প্রকৃত মুসলিম নারীর দুনিয়ার জীবনে তাই হল আদর্শ। দুনিয়ার জীবনে একজন মুসলিম নারীর উচিত আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি হাসীলের নিমিত্তে পিতা-মাতা স্বামী-স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের সাথে সৎ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর যথার্থ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগী করা এবং অন্যকে ইবাদত বন্দেগী করার জন্যে উৎসাহিত করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত শান্তি। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট এ রকম ইবাদত বন্দেগীই গ্রহণীয়। কিন্তু যারা দুনিয়ার সংসার জীবন পরিত্যাগ করে দিবা রাত্র আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে ডুবে থাকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করতে হবে. কেননা রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায় এরূপন নয় যে, দুনিয়ার সংসার জীবনের সিদ্ধ ব্যাপর পরিত্যাগ করে কেবল তার ধ্যানে ডুবে থাকুক কেননা এ ধরনের মানুষের দুনিয়ার সংসার বিবাহ-শাদী কোন কিছুর দরকার হয়না। তারা কেবল তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যেই আল্লাহর ধ্যানে

ডুবে থাকে। তবে এ ধরণের মানুষের স্মরণ রাখা উচিত দুনিয়ার সংসার জীবন পরিত্যাগ করে কেবল আল্লাহ তায়লার ধ্যানে মগ্ন থাকার মধ্যে বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে।

এছাড়া দুনিয়ায় সংসারের মায়া মমতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীকে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল দুনিয়ার সংসার জীবনের সুখ শান্তির মধ্যে থেকে ইবাদত বন্দেগী তথা আল্লাহ তায়ালা সমস্ত হুকুম পালন করা হল সত্যিকার মুমিনের পরিচয়। কেননা যারা দুনিয়ার জীবনে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি কিছু নেই। সে তো সমস্যা মুক্ত বিধায় ঐ ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকা যতদূর সহজ আর একজন সংসারী লোকের পক্ষে তত সহজভাবে ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা সংসারী লোকের সংসারের সকলের দায় দায়িত্ব পালন করে তার পরে ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে সঙসারিক কাজ কর্ম ও দায়িত্ব পালনও ইবাদতের মধ্যে গণ্য। যার কারণে যারা দুনিয়ার সংসার জীবনের কঠিন কার্য সাধন করে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট অনেক বেশি। ইসলাম বৈরাগ্যতা পছন্দ করে না।

তবে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুনিয়া হল আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ। তাই দুনিয়ার সংসার জীবনকে বিসর্জন দিয়ে দিবা রাত্র আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা প্রকৃত মুমিনের পরিচয় নয়। দুনিয়ার সংসার ধর্মী নারীদের আদর্শের প্রতীক হযরত ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ তাপসী। তিনি অভাব অনটনের সংসারের জীবন যাপন করে এবং নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হিসেবে সকলের দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েও নিরলস ও একাগ্র চিত্তে বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে ডুবে থাকতেন। কিন্তু দুনিয়ার সংসার জীবনের কোন সমস্যাই তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগী হতে দূরে রাখতে পারেনি বরং তিনি সঙসার জীবনের প্রতিটি কাজ কর্মই আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও ইবাদত হিসেবে পালন করতেন। সাংসারিক জীবনের সকল কাজ কর্মের মধ্যে দেখা গেছে দৈহিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ সংসারের কাজে নিযুক্ত করেছেন। অন্য দিকে তার রসনা এবং অন্তর আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ চর্চায় রত রয়েছেন। এমনকি যাতায় আটা

পিষতেছেন, উনুনে রুটি সেকিতেছেন, এমনি মুহূর্তেও মুখে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র নাম নিতেছে। কিন্তু সংসারের সকল কাজ কর্ম শেষ করে সন্তানদিগকে ঘুমায়ে যখন সম্পূর্ণ অবসর হতেন তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নফল নামায ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় রাতে স্বামী সন্তান নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লে সে সকলের অজান্তে বিছানা হতে ওঠে পাকপবিত্র হয়ে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে রত হয়ে যেতেন। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন মনে হত যে তার দুনিয়ার প্রতি কোন খেয়াল নেই।

নামায আদায়ের পরে মহান করুনার আঁধার আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর দরবারে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করে এমনভাবে গোনাহের জন্যে ক্রন্দন করতেন মনে হত যেন সে এ পৃথিবীর মধ্যে বড় পাপী ও গোনাগার। মোনাজাত করার সময় এমনভাবে ক্রন্দন করতেন তার দু'চোখের পানিতে বছানাদি পর্যন্ত সিক্ত হয়ে যেত। তবে আশ্চার্যের বিষয় হল এমন আবেগ জড়া প্রার্থনা করার সময়ও কোন দিনই কিছু কামনা করেননি। তিনি গোনাহের ক্ষমা চেয়ে নিজেদের ও অন্যদের পরলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন। সপ্তাহের দু'এক দিন ছাড়া প্রতি দিন রোযা রাখতেন তাও আবার সন্ধ্যায় পানি দ্বারা ইফতার করে পরের দিনে রোযার নিয়ত করতেন।

প্রিয় পাটক পাঠিকাগণ! একটু ভেবে দেখুন নবী করিম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) কত কষ্ট করে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি হাসিলের নিমিত্তে ইবাদত বন্দেগী করেছেন। তবে কেবল যে দিবা-রাত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন তাও নয়, দুনিয়ার সকল কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতেন তবে দুনিয়ার কাজ কর্ম করার সময় ও মুখে আল্লাহর নাম জপতে থাকতো। আর প্রকৃত মুমিনের পরিচয়ই হল তা যে সে দুনিয়ার কাজ কর্ম করার সময়ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ কর্ম সমাধান করে আবার ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে মগ্ন হয়ে যেতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট কতিপয় রমণী কিছু নসীহতের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, হে ভগ্নীগণ! আমার পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে যদি সিজদা করার বিধান

থাকত তাহলে আমি নিশ্চয়ই স্ত্রী লোকদের প্রতি তাদের স্বামীগণকে সিজদাহ করবার নির্দেশ দিতাম। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন নারীদের কাছে স্বামী কত অধিক মর্যাদার পাত্র এবং সেই সম্মানীয় স্বামীদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত। একথা বলার সাথে সাথে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাদের কাছে একটি কাহিনী বলতে শুরু করলেন, আমি আমার আব্বাজানের কাছে বসেছিলাম এমনি সময় হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম জনৈকা দাসী হঠাৎ আদরের সাথে বলতে লাগলেন হুজুর। আমার সওদাগর মুনিব বিদেশে যাবার সময় তার পত্নীকে বলে গিয়েছেন যে তিনি কোন সময় যেন দোতালা হতে নিম্নে না আসেন কিন্তু তারা যেই বাড়িতে বসবাস করেন সেই বাড়িতে নিচতলায় উক্ত মুনিব পত্নীর বৃদ্ধা মা বাবাও বসবাস করেন। কিন্তু এখন তার পিতা মাতা উভয়ই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু তাদের দেখা-শুনা ও সেবা যত্ন করার মত এক মাত্র কন্যাই রয়েছে। কিন্তু সেই কন্যা তো স্বামীর নির্দেশে আবদ্ধ অর্থাৎ স্বামীর হুকুম ছাড়া সে নিচতলায় আসতে পারে না। এই মুহূর্তে আপনি যদি নির্দেশ দিতেন, তাহলে তিনি নেমে এসে রোগাক্রান্ত পিতা মাতার খেদমত করতে পারতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈকা দাসীর কথা শুনে বললেন, তাকে আমি তেমন আদেশ করতে পারব না। কেননা তার জন্যে স্বামীর হুকুম পালন করা অবশ্যই কর্তব্য এমন কথা শুনা মাত্র দাসী চলে গেলেন। চলে যাবার দু'এক দিন পরে দাসী আবার ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার মুনিব পত্নীর অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তার বিশেষ কথা হল তার শেষ সময় তিনি তার কন্যাকে একটু দেখে যেতে চায়। এ মুহূর্তে আপনি যদি অনুমিত দান করতেন তা হলে মুহূর্ষ বৃদ্ধের মনের একান্ত বাসনাটি পূর্ণ হত। এই বারও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই পূর্বোক্ত জবাব দান করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা মুনে দাসী চলে গেলেন, কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে বলল, হে নবী (সাঃ) এই মাত্র বৃদ্ধা লোকটি মৃত্যু বরণ করেছে তার ভাগ্যে কন্যা দেখা হল না তবে বৃদ্ধা লোকটির অবস্থাও তেমন ভাল না এই মুহূর্তে আপনি হুকুম করলে হয়তো বৃদ্ধা মাতার আদরের কন্যাকে দেকে বিদায়ের মুহূর্তে প্রাণে একটু শান্তি পেতেন। আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই বারও সেই একই জবাব দিলেন এবার দাসী রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর কথা শুনে চলে গেলেন। কিছু সময় যেতে না যেতেই বৃদ্ধা লোকটিকে দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই স্ত্রী লোকটির স্বামী গৃহে ফিরে সকল ঘটনা শুনলেন। তবে উক্ত ঘটনা শুনে খুবই দুঃখ নিয়ে বললেন, এমন অবস্থার সময় তোমাকে নিচে নামতে বারণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আসলে তুমি ভুলই করছ। স্বামীর এমন কথা শুনে স্ত্রী লোকটি বললেন, দেখুন আমি কোন ভুল করেনি বরং আমি ঠিকই করেছি। কেননা এর ফলে কি ঘটেছে শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আমি একাধারে তিন রাত পর্যন্ত সপ্নে দেখেছি আমার পিতা মাতা উভয়েই চির শান্তিময় বেহেশতের মধ্যে বিরাট অট্টালিকার অভ্যন্তরে বসবাস করেছেন এবং তাদের খেদমতের জন্যে অসংখ্য দাস-দাসী নিযুক্ত রয়েছে। তাদের সেখানে আরাম-আয়েশ সুখ শান্তির অভাব নেই। তাদের সুখ শান্তি দেখে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কোন পুণ্যের ফলে এরূপ প্রতিদান লাভ করেছেন।

একথার জবাবে তারা বললেন, উহা আমাদের কোন পুণ্য ফল নয়, বরং মা তোমার পুণ্যেই আমরা ইহা প্রাপ্ত হয়েছি। নবী করিম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পবিত্র মুখের কথা শুনে উপস্থিত রমণীগণ বিস্মিত হয়ে মনের খুশীতে সেখান হতে বিদান নিলেন। তারা প্রায়ই নবী করিম (সাঃ)-এর হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট এসে বিভিন্ন সময় উপদেশ ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করতেন। আদর্শের প্রতীক নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) সাংসারিক জীবনে দৈনন্দিন ঘরের যে সমস্ত কাজ করতেন তার প্রত্যেকটি কাজ ও কথার মধ্যে সততা, খোদাভীরুতা, এখলাস নিহিত থাকত। কেবল গৃহের কাজ কর্মের মধ্যে এ মহৎ গুণগুলো নিহীত ছিল তা নয়। এমন কি তার শিশু সন্তানদের সাথে দৈনন্দিন যেসকল কথা-বার্তা বলতেন তার মধ্যেও আল্লাহ রাসূলের অসন্তুষ্টিমূলক আদর্শ নিহীত ছিল। আমাদের বর্তমান সমাজে দেখা যায় অনেক পিতা-মাতাই সন্তানদের আদর করতে যেয়ে তাদের খুশী করার অক্ষ্যে অনেক অসত্য ঘটনা ও কথা বলেন। কিন্তু নবীজীর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কোন রূপ অসত্য বানোয়াটি কথা বলে সন্তাদের মন খুশী করত না বরং তাদের কে কবরের ভয়াবহ আযাব ও হাশরের ময়দানের হিসাব নিকাশ ও মৃত্যুর কষ্ট প্রভৃতি কথা বলে ভয় দেখিয়েছেন। আর চির

শান্তিময় বেহেশতের সুখ শান্তি আরাম আয়েশ বেহেশতের হুর গেলমান ফল ও ফুল ইত্যাদির কথা বলে চির শান্তিময় বেহেশতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান যুগের আধুনিক পিতা-মাতার মত অসত্য বানোয়াটি কথা বলে সন্তানদের মনে আনন্দ দিতেন না। তবে তার বর্ণনাকৃত ঘটনা ও কথা ছিল সত্য। হযরত ফাতেমা (রাঃ) সত্য কথা বলার সাধ্য সেই যে সন্তানদের হৃদয়ে আনন্দ ও ভয় দিতেন তা একটি ঘটনার মধ্যে বর্ণনা করে দিখান হল যা নিম্নে প্রদত্ত হল। ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন (রাঃ) উভয়েই শৈশবকালে কোন এক সময় তারা বাহির হতে ঝগড়া করে ঘরের এসে মায়ের কাছে উভয় উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছে। কিন্তু তাদের অভিযোগ শুনে বুঝা যেতনা কে দোষী আর কে নির্দোষী। তবে মাতা উভয়ের কথাই কান পেতে শুনতেছে যেহেতু তার কাছে দুটি সন্তানই সমান আদর ও সমান স্নেহের অধিকারী। কেহই নিজের দোষ স্বীকার করছেন না। হযরত ফাতেমা (রাঃ) মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন।

যাইহোক সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উপায় স্থির করে আদরের পুত্রদেরকে বললেন দেখ। বাবা তোমরা কে দোষী আর কে নির্দোষী তা বিবেচনা করার আগে তোমাদের কিছু কথা বলব তা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে। বিশ্ব বিভু আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তোমরা উভয়ে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অমান্য করে মহা অন্যায় করেছ একথা সত্য। তোমাদের এমন অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের কে রোজ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞসা করেন। তখন তোমরা কে কি জবাব প্রদান করবে বলতো? মনে রেখ সেই কঠিন কেয়ামতের দিন যদি তোমরা লা জাবাব হয়ে যাও, তাহলে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তি দান করবেন। নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কথা শুনে ইমাম দ্বয়ের মনে ভয় জেগে গেল। শুধু ভয় নয় তারা তাদের মায়ের কাছে করুন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন মা, তাহলে এই ভয় হতে রক্ষা পাওয়ার কি পন্থ আছে তা আমাদের বলুন। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন। বাবারা, তোমাদের ভয়ের কারণ নেই, কেননা রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা আবার বলেছেন, কেহ যদি কোন ঘটনা চক্রে অন্যায় করে এবং এ ধরনের অন্যায় আর করবেনা বলে খালেস দিলে তাওবা করে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সত্য উপদেশ মূলককথা

শুনে ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তাদের আম্মাকে বললেন মা আমরা এমন কাজ আর কোন দিন করবনা বলে খালেস দিলে তাওবা করে দেবেন। সত্য উপদেশ মূলক কথা শুনে ইমাম ভ্রাতাদ্বয় তাদের আম্মাকে বললেন মা আমরা এমন কাজ আর কোন দিন করবনা বলে খালেস তাওবা করব। তবে আপনি আমাদেরকে বলেদিন কিভাবে তাওবা করতে হয়?

তখন মা ফাতেমা (রাঃ) বললেন বাবা চল, আমরা অজু করে পাক পবিত্র হয়ে আসি। মা ফাতেমা (রাঃ) আদরের ছেলেদের নিয়ে অজু করে এসে জায়নামাযে বসে গেলেন। জায়নামাযে বসে খালেস দিলে তাওবা করলেন, হে আল্লাহ, আমরা আর কোন দিন এ ধরনের অন্যায় কাজ করবনা আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তারপর আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'হাত তুলে ক্ষা চেয়ে ক্রন্দন করলেন। ইমাম হাসান হোসাইন (রাঃ) আদর্শের প্রতীক আবেদা পুণ্যশীলা মায়ের কাছ হতেই ন্যায়ের মূল্য অন্যায়ে দোষ এবং মহান করুনার আঁধার আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর নিকট মুক্তি লাভের পথ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেন। নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কত হেকমতের মধ্যে দিয়ে পুত্রদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করেছেন উক্ত ঘটনার মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার ব্যক্তিগত জীবন হতে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পদে পদে কিভাবে পরহেজগারী অবলম্বন করেছিলেন। তাই আসুন আমরা আমাদের মা বোনদেরকে মা ফাতেমা (রাঃ) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আদর্শ জীবন গঠন করি।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) জীবনের প্রতিটি পদে পদে কিভাবে খোদা ভীতি অবলম্বন করেছিলেন। কোন এক সময় মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশ রমণীগণ তাদের কোন এক ভোজ সভায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে দাওযাত করল। তবে মা ফাতেমা (রাঃ)-এর এ ধরনের ভোজ সভায় উপস্থিত হতে মনের দিক হতে মোটেই ইচ্ছা ছিলনা। যাইহোক তবুও রাসূলূল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ক্রমে তিনি সংগত ও শোভনীয় পোশাকে দেহাবৃত করে নবী কন্যা হিসেবে মার্জিত হয়ে ভোজ সভায় উপস্থিত হলেন। ভোজ সভায় উপস্থিত হয়ে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা দেখলেন প্রত্যেক রমণীরাই মূল্যবান বেশ ভুষায় সজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠানে দর্শনীয় বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) উপস্থিত রমণীদের নব নব সাজে সজ্জিত বেশ ভুষার চাককিক্যের অবজ্ঞা করে বললেন, হে রমণীগণ, এসব সাজসজ্জা সবই

ক্ষণস্থায়ী। আস আমি তোমাদেরকে পরকালীন স্থায়ী সুখ সম্পর্কে কিছু বলি। এমন কথা বলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের কথা বর্ণনা করে পরলৌকিক স্থায়ী সুখ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করলেন। তার মূল্যবান উপদেশ শ্রবণ করে তাদের পৌত্তলিকতার অসারতা অনুধাবন করতে পারল এবং আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ইসলামের মাহাত্ম মর্যাদা উপলব্ধি করে ঐ মুহূর্তে অনেকেই ইসলামের অমীয় সুধা গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) শত ব্যস্ততা ও কার্যের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে কোন সময় শৈথিল্য প্রকাশ করেন নি। বরং সাংসারিক কাজ করে সময় পেলেই জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন, নবী (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) বলেন- হযরত ফাতেমা (রাঃ) অভাব অনটন সংসারের মধ্যে জীবন যাপন করে ইবাদত বন্দেগীতে কঠোর সাধনা করেছেন। সারা দিনের সংসারিক হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরে স্বামী সন্তান বা যখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তো পৃথিবী যখন নীরব নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে যেত কোথাও পশু পাখির শব্দ নেই এমনি মুহূর্তে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমার অজান্তে, আমার পার্শ্ব হতে উঠে গিয়ে পাক পবিত্র হয়ে সকলের অজান্তে নীরবে আল্লাহ তায়ালার জিকির করতেন সমস্ত রাত। তার পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোনাগার উম্মতের জন্যে ক্ষমা চেয়ে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতেন। দেখা গেছে তার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি নেমে আসত। মুনাজাতের মাধ্যমে বলতেন, হে আমার প্রভু! তুমি আমার আব্বাজানের গোনাহগার উম্মতদেরকে ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাত দান কর। হে আমার মাবুদ, তুমি আমার পিতার গোনাহগার উম্মতদেরকে বিচার অতি সদয়ভাবে কর। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে তার আদরের পুত্র ইমাম হাসান বলেছেন– আমার মা বছরের অধিক সময়ই নফল রোযা রাখতেন। আর রাতের কিছু সময় নিদ্রায় যেয়ে সারা রাত ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে কাটাতেন। আর তিনি আমার নানাজান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গোনাহগার উম্মতদের ক্ষমা চেয়ে এমনভাবে ক্রন্দন করতেন, এক সময় তার চোখর পানিতে বক্ষঃস্থল ভেসে যেত। তবে তার মুনাপাতে কোন সময় নিজের কল্যাণের কথা শুনতে পেতাম না।

অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায় নবী করিম (সাঃ)-এর জামাতা শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমার প্রিয়তমা স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন খোদা ভক্ত ও ধর্ম ভীরু। কোন এক সময় আমি ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা নিজ হাতে রুটি তৈরি করেছে ও মুখে আল্লাহ তায়ালার নাম জপেছে, আবার অনেক সময় এমনও দেখা গেছে হযরত ফাতেমা (রাঃ) আদরের শিশু পুত্রকে দোলনায় রেখে দোলনার রশি পায়ে বেঁধে দোলনা টানতেন, হাতে যাঁতা ঘুরিয়ে গম পিষতেন এবং মুখে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম জপতেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ইবাদত বন্দেগীতে খুশী হয়ে নিজেই বলেছেন, ফতেমা আমার সঙ্গে চির শান্তিময় বেহেশতে প্রবেশ করবে।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) ইবাদত বন্দেগীর কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, কোন এক সময় আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করলাম। আমি তার গৃহে যেয়ে দেখতে পেলাম তিনি ঘুমন্ত ইমাম হাসান ও হোসেন কে বাতাস করছেন। কিন্তু মুখে আল্লাহর নাম নিতেছেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে কত দূর নিজেকে মগ্ন রাখতেন তার কিছু ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হল– যে সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ বহন করবে তার ইবাদত বন্দেগীর রূপরেখা–

উম্মে আয়মন (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমার (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম তার গৃহের দরজা ভেতর হতে বন্ধ। মনে মনে তখন আমি ভাবলাম তাহলে কি তিনি নিদ্রা যেতেছেন না অসুস্থ আছেন তখন তিনি আবার এ কথাও ভাবলেন যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) তো কোন সময় দিনে নিদ্রায় যান না। এমনি চিন্তা ভাবনা করে উপায়ন্ত না দেখে তিনি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেলেন নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) মাটিতে পড়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। গৃহের মেঝের এক কোণে পড়ে আছে যব ও যাতা, আর তার আদরের শিশু পুত্র হযরত হুসাইন দোলনায় শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। তিনি গৃহের মধ্যে আর দেখতে পেলেন একজন সুন্দরী অপরিচিতা রমণী বসে বসে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) যাতা ঘুরিয়ে যব পিষছেন। আর ইমাম হুসাইনের দোলনাটি তালে তালে দুলছে। আর অন্য একজন রমণী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কাছে বসে ঠোঁট নেড়ে তসবীহ পাঠ করেছেন। এমন অবস্থা দেখা মাত্র উম্মেআয়মন অবাক হয়ে

গেলেন। আর অবাক হবার কথাও যেহেতু এরূপ দৃশ্য আর কখন দেখেনি। তিনি ঐ মুহূর্তেই ছুটে গেলেন হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর পিতার নিকটে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়মানের মুখে উক্ত ঘটনা শুনে বললেন, আমার আদরের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) আজ রোযা রেখেছে, সারাদিন সাংসারিক কাজ কর্ম করতে যেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আবেদা হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত প্রিয়জন বলেই তার দুঃখ কষ্ট আল্লাহ নিজে সহ্য করতে পারননি বলে, তিনি তিনজন ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন তার কাজ কর্ম সম্পন্ন করার জন্যে।

আল্লাহ তায়ালা কখনোই চান না যে তার প্রিয় বান্দী ফাতেমা (রাঃ)-এর কষ্ট হোক কিংবা কাজগুলো অসম্পন্ন অবস্থায় পড়ে থাকুক। যার কারণে তিনজন ফেরেস্তাকে তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ) তিনটি কাজে নিযুক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা শুনে উম্মে আয়মন অবাক হয়ে গেলেন। যার মহান করুনার আধার আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর হুকুম আহকাম পালনের মধ্যে দিয়ে তার রেজামন্দি অর্জন করে তার প্রিয়জন হয়, তাদের সকল কার্যের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই হয়ে যান অর্থাৎ তার সকল কাজ কর্ম, রক্ষণাবেক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতে অর্পিত থাকে। আর একথাও সর্বজন সত্রকথা যারা আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম পালনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত ঈমানদার রূপে গণ্য হয় এবং জীবনের প্রতিটি কাজেই আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়। তাদের পার্থিব কোন সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে না বরং তাদের সমস্যার সমাধান কোথা হতে হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারবে না। আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জন হতে পারলে সকল সমস্যার সমাধান যে আল্লাহ তায়ালা করে দেন তার জলন্ত প্রমাণ বহন করে ঐতিহাসিক এক ঘটনার মধ্যদিয়ে। যা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে খাবার মত কিছুই ছিলনা। সেদিন হযরত আলী (রাঃ) অনেক চেষ্টা করেও কোন কাজের সন্ধান মিলাতে পারেনি। সন্ধ্যার সময় মলিন মুখে গৃহে ফিরে আসলেন। হযরত আলী (রাঃ) ফতেমা (রাঃ) কে কিছু না বললেও ফাতেমা (রাঃ) বুঝতে বাকী রইলনা, যার কারণেই ফাতেমা (রাঃ) বললেন হে আলী (রাঃ), তোমার মলিন মুখ দেখে আমি সহ্য করতে পারতেছিনা, তুমি কাজ মিলাতে পারনি বলে মনে দুঃখ নিও না। আমি কষ্ট করতে সম্মতি আছি। যেহেতু সুখ দুঃখ আল্লাহর পক্ষ

হতেই হয়। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন, হে আলী (রাঃ) এভাবে কাজের জন্যে না ঘুরে তার চেয়ে ছোট খাট একটা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারলে অবশ্যই ভালই হত। হযরত ফাতেমা (রাঃ) কথা শুনে বললেন, আমার তো এ রকম একটি মনোভাব ছিল। কিন্তু মুলধনতো নেই। মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারছিনা বলেই এ রকম প্রত্যহ মজুরী করার জন্যে ঘুরে বেড়াতে হয়। হযরত আলীর (রাঃ) হৃদয় গ্রাহী কথা শুনে নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন– আমার এক দুলাভাই আছে যার নাম হল ওসমান সে একজন বিরাট ধনী মানুষ। তার কাছে কিছু টাকা মূলধন হিসেবে চেয়ে দেখতে পারেন? যদি কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে যে কোন একটা ব্যবসা শুরু করে দিন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কথায় হযরত আলী (রাঃ) এ সম্মতি হলেন।

যাইহোক হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কথা অনুযায়ী পরের দিন সকালে উঠেই হযরত ওসমান গণির বাড়ির দিকে রওয়না হলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পরই তিনি দেখতে পেলেন একজন অপরিচিত ব্যক্তি একটা উট নিয়ে রাস্তার পাশ্বে দণ্ডায়মান আছেন। লোকটি হযরত আলী (রাঃ) কে দেখা মাত্রই বলে ফেললেন ভাই আপনি কি এই উটটি খরিদ করবেন? তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, মনের একান্ত ইচ্ছা থাকলেও উট কিনার মত অর্থ আমার নেই। তখন লোকটি বললেন, আমাকে আপনি না চিনলেও আপনাকে আমি অবশ্যই চিনেছি। আপনি হলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জামাতা শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)। আপনি যদি ১০০ টাকার বিনিময় এই উটটি কেনার আশা করেন তাহলে আমি আপনাকে বাকীতে দিয়ে দেব। আপনি আপনার সুযোগ মত বিক্রয় করে আমার প্রাপ্য একশত টাকা আমাকে দেবেন। ঠিকই লোকটির কথা মত হযরত আলী (রাঃ) একশত টাকা মূল্যে ঠিক করে বাকীতে উটটা গ্রহণ করে বাড়ির দিকে চলে গেলেন। কিছু দূর পথ চলতে না চলতেই এক ব্যক্তির সাথে তার দেখা হল, সে বললেন, হে ভাই হযরত আলী (রাঃ) আপনার এ উটটা আমার কাছে বিক্রয় করবেন কি? তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ' আমি উটটি বিক্রয় করব। এ কথা বলার পরই হযরত আলী (রাঃ) সেই লোকটির নিকট দেড়শত টাকা মূল্যের বিনিময় উটটি বিক্রয় করে দিলেন। লোকটি উট নিয়ে চলে গেলেন আর হযরত আলী মনের খুশীতে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। এমনি সময় হঠাৎ

করে প্রথম ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে (যে ব্যক্তি বাকীতে উট বিক্রয় করে ছিলেন) বললেন– হে ভাই হযরত আলী (রাঃ), আপনি কি আপনার উট বিক্রয় করেছেন? তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন হ্যাঁ ভাই, উটটি আমি দেড়শত টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করেছি। হযরত আলীর (রাঃ) কথা শুনা মাত্রই লোকটি বললেন, আমার প্রাপ্য একশত টাকা আমাকে ফেরত দিয়ে লাভের অবশিষ্ট টাকা নিয়ে হযরত আলী বাড়ি ফিরলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পরই পথি মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হযরত আলীর (রাঃ) দেখা হল। হযরত আলীর (রাঃ) শ্বশুর আব্বা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে সন্না খুলে বললেন। নবী করিম (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে আলী! তুমি কি চিনতে পেরেছ এই দুই ব্যক্তি কে? তোমার নিকটে প্রথমে যে ব্যক্তি উট বিক্রয় করে ছিলেন। জবাবে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হুজুর আলী কাউকেই চিনতে পারেননি। হযরত আলীর কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমার কাছে যে উট বিক্রয় করেছে সে হলেন হযরত মিকাইল (আঃ) আর উট ক্রেতা হলেন হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মনের আশা পূর্ণ করার জন্যে বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তোমার কাছে উট বেচাকেনা করতে হাজীর হয়েছিলেন।

যাইহোক এখন তুমি তোমার লাভের টাকা দিয়ে কাপড়ের ব্যবস্থা করতে থাক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখের কথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) খুবই খুশী হলেন যা বলে শেষ করা যাবেনা। মনের খুশীতে হযরত আলী (রাঃ) গৃহে ফিরলেন। বাড়ি ফিরে সকল ঘটনা ফাতেমা (রাঃ) কে খুলে বললেন! হে ফাতেমা, আমি আজ হতে তোমার মনের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসায় হাত দিলাম, সর্ব প্রথমই আমার কেনা-বেচা হল হযরত মিকাইল ও হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর সাথে। অবশ্য হযরত মিকাইল ও হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর সাথে কেনা-বেচা শুরু হওয়ায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) খুবই খুশী হলেন। বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তায়ালার দরবারে অগণিত শুকরিয়া আদায় করে ব্যবসার মঙ্গলের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করলেন।

আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জন হতে পারলে আল্লাহ তায়ালার কিভাবে বান্দাহকে সাহায্য করেন। যে সাহায্যের কথা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি। যেমনি ঘটেছিল নবী করিম (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ)-এর উট

বেচা কেনার মধ্যে দিয়ে। অন্য আর এক দিনের ঘটনা একদা রাতে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে ইচ্ছা পোষণ করে গৃহ হতে। বের হয়ে দেখতে পেলেন বাড়ির প্রবেশ পথেই একটি উট দাঁড়িয়ে আছে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে দেখামাত্রই উটটি মানুষের জবানে স্পষ্ট ভাষায় বললো, হে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা, আমার সালাম, গ্রহণ করুন। আপনার খেদমতের জন্যেই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনার সাথে আমি ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করতে যাব। অনুগ্রহ করে আপনি আমার পিঠে উঠে বসুন আপনাকে আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব। হযরত ফাতেমা (রাঃ) উটটির কথা শুনা মাত্রই অবাক হয়ে গেলেন, আর অবাক হবার কথাও।

যাইহোক তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বললেন। হে আমার প্রভু। তুমি সারা জাহানের মালিক, তোমার মহিমার অন্তনেই, তুমি তোমার অধম দাসীর প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ এ জন্যে লাখ লাখ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। চিরদিন তুমি তোমরা এ দাসীর প্রতি সন্তুষ্ট থেকো।

আল্লাহর দয়ায় হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিপদ মুক্তি

একদা ঈদের দিনে মদীনার প্রতিটি গৃহেই ঈদোৎসবের বিভিন্ন ধরনের আয়োজন চলছে। মদীনার ঘরে ঘরে নতুন নতুন খাদ্য সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। কেবল খাদ্য দ্রব্য তৈরির মধ্যেই আনন্দ চলছে তা নয় বরং যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রত্যেকেই নতুন বসণ ভূষণ পরে মনের আনন্দে একগৃহ হতে অন্য গৃহে যাচ্ছে। এমন আনন্দ উল্লাসের মধ্যেও মদীনার এক গৃহের মধ্যেও কোন ধরনের আনন্দ ছিলনা অর্থাৎ ঈদ বলতে কোন নাম নিশানা ছিলনা। কেহই সে গৃহে যেতনা বলে গৃহ ছিল অতি নির্জীব, নিষ্প্রাণ। ঐ গৃহের মালিক ছিলেন ইসলামের বীরসেনানী নবী করিম (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ)। ঐ গৃহে ঈদের উৎসব কোন সাজসজ্জা, নতুন খাদ্য পাকান কিছুই হল না। গৃহের মালিক হযরত আলী (রাঃ) ফজরের নামায আদায়ান্তে কোথায় যে চলে গিয়েছে তা কোনই খবর নেই। গৃহের মধ্যে শুধু হযরত ফাতেমা (রাঃ) হাতে আটা পিষিবার কাজ করতেছেন আর

পবিত্র মুখে আল্লাহ তায়ালার নাম নিতেছে। আর ইমাম হাসান হোসাইন গৃহের আঙ্গিনায় খেলা করতেছে। তারা তাদের সম বয়স্ক ছেলে মেয়েদেরকে নতুন সাজে সজ্জিত দেখতে পেল আর তাদের মনের মাঝে আনন্দ ধরছেনা। এক মাত্র তারা দুই ভাই পুরাতন পোশাক পরিধান করে প্রতিদিনের মত আজও বাড়ির আঙ্গিনায় খেলা করতেছে। হঠাৎ করে একটি বালক দৌড়ে এসে বলল হে ভাই! হাসান হোসাইন তোমাদের কি নতুন কোন জামা নেই যে আজ ঈদের দিন। আমরা এ মহল্লাহর সকল ছেলে মেয়েরাই নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছি, আর তোমরা এ মহল্লাহর সকল ছেলে মেয়েরাই নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছি, আর তোমরা প্রতিদিনের মত আজও পুরাতন কাপড় পরিধান করে খেলা করতেছে এর কারণ কি? তোমার আব্বা আম্মা তোমাদের জন্যে বাজার হতে নতুন জামা ক্রয় করেনি? ক্ষুদ্র বালক ইমাম হাসান ও হোসাইনের এখনও এতসব বুঝের উঠার বয়স হয়নি। যার কারণেই তারা তাদের পিতা-মাতার অবস্থা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখত না। সত্যি ইমাম হাসান ও হোসইন সমবয়সী ছেলে মেয়েদের কথা অনুযায়ী গৃহে ফিরে মাকে জড়ায়ে ধরে চুমু খেয়ে বলেন মা, আজতো ঈদের দিন। আমাদের বন্ধু বান্ধব সকলেই নতুন জামা পরিধান করে আনন্দ করতেছে। আর আমরা তো এখন পর্যন্ত নতুন কাপড় পরিধান করিনি, আমাদের নতুন কাপড় কোথায়? মাতা পুত্রদের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু ভাবতেছে আর মনে মনে বলছে সত্যি। তারা যা বলেছে তা তো মিথ্যা কিছুই না। পাড়া পড়শীর সকল ছেলে মেয়েরা নতুন জামা কাপড় পড়েছে ওদেরও তো পড়তে মন চায় এটা স্বাভাবিক। তারপরও ফাতেমা (রাঃ) মনকে শান্ত্বনা দিয়ে বলছে আল্লাহ তায়ালা যখন যেভাবে রাখে তার ওপরই খুশী থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত কোন কিছু উপায়ন্ত না দেখে অবশেষে বললেন, বাবা এখন পর্যন্ত তোমাদের জামা তৈরি হয়নি। তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই তোমাদের জামা পাবে। তোমাদের চাইতে হবে না।

মায়ের কথার পরে পুত্ররা বললেন মা কখন আর তৈরি হবে? আজ ঈদের দিন। সকলে নতুন জামা কাপড় পরিধান করতেছে আর আমরা এখন ও নতুন জামা পাইতেছিনা। ছেলেদের কবল হতে ফাতেমা (রাঃ) কোন ভাবেই রেহাই না পেয়ে বললেন বাবা বাহির হতে একটু খেলাধূলা করে আস তার পরই তোমরা তোমাদের নতুন জামা কাপড় পাবে। ইমাম হাসান হোসাইন

খেলতে যাওয়ার পরই হযরত ফাতেমা (রাঃ) রুটি বানাতে বসলেন। যেহেতু নবী করিম (সাঃ)-এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ)-এর বাহির থেকে আসার সময় হয়েছে। নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হাতে রুটি বানাইতেছেন আর মনে মনে ভাবতেছেন ছেলেরা বাহির হতে খেলা ধুলা করে এসেই তো নতুন জামার বায়না ধরে বসবে, তখন ওদের কি বলে শান্ত্বনা দিব যাতে ওরা খুশি হয়। এমন চিন্তা ভাবনা করতেছে এমনি সময় হঠাৎ করে ছেলেরা বাহিরে হতে গৃহে ফিরলেন। গৃহে ফিরেই বললেন মা, তাড়াতাড়ি আমাদের নতুন জামা কাপড় দিয়ে দাও। মা উপায়ন্ত কোন কিছু না দেখে পুত্রদ্বয়কে শান্ত্বনার স্বরে বললেন, তোমাদের জামা এখনও তৈরি হয়নি। তোমরা গোসল দিয়ে আস। সত্যি, আদরের ইমাম হাসান হুসাইন মনে মনে ভাবলেন গোসল দেওয়ার ফাঁকে তাদের জামা অবশ্যই তৈরি হয়ে যাবে। যার কারণে মায়ের খুশীতেই ইমাম হাসান ও হুসাইন গোসল করতেছে। এদিকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মনের চিন্তা ভাবনা আরও বেড়ে গেল, মনে মনে ভাবতেছেন, এবারে কি বলে পুত্রদের শান্ত্বনা দিব? এভাবে কতবার আর ফাকী দেওয়া যায়? এবারে গোসল করে নতুন জামা না পেলে ওরা কেঁদে কেঁটে আকুল হয়ে পড়বে। এসব চিন্তা ভাবনা করে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অস্থির হয়ে পড়লেন ইমাম হাসান হুসাইনের গৃহে ফিরার সময় হয়েছে মনে করে নবী করিম (সাঃ)-এর দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে অযু করে এসে জায়নামাযে বসে গেলেন, এবং রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'হাত তুলে মনের চাপা দুঃখকে বললেন– হে আমার প্রভু, তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা। তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা। তুমি আমার সকল সমাধানকারী বিধায় তুমি তোমার এই অধম দাসীর উপায় করে দাও।

হযরত ইমাম হাসান হুসাইন (রাঃ) মন থেকে নতুন জামার স্মৃতিকে মুছে ফেল, নতুবা আদরের ছেলেরা গোসল করে যখন আমার কাছে নতুন জামা চাইবে তখন আমি কি বলে ওদের শান্ত্বনা দিব। হে আমার প্রভু তুমি আজ তোমার এ অধম দাসীকে বিপদ হতে মুক্তি করে দাও। আমি আমার জীবনে আর কোন দিন এত বড় বিপদের মধ্যে পড়িনি। এ মহাবিপদ হতে এক মাত্র তুমিই উদ্ধার করতে পারবে। সত্য নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আবেগ মিশ্রিত ক্রন্দনরত প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করে নিলেন। আর কবুল করবেন না কেন আল্লাহ তো নিজেই বলেছেন

আমাকে কেহ একবার ডাকলে আমি তার ডাকের ১০ বার সাড়া দেই।

যাইহোক নবী হযরত ফাতেমা (রাঃ) জায়নামাঁযে বসে সিজদায় পড়ে কাঁদতেছে, কিন্তু গৃহের বাইরে কি হচ্ছে সে দিকে তার কোনই খেয়াল নেই। তার দুই চক্ষু হতে কেবল দরবিগলিত অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতেছিল। ওদিকে তার গৃহের দরজায় জনৈক ব্যক্তি বার বার আওয়াজ করতে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ ধ্যানে মগ্ন ফাতেমা সে ডাক শুনতে পাচ্ছেনা। এদিকে ইমাম হাসান হুসাইন নতুন জামার প্রত্যাশায় গোসল করে এসে গৃহের দরজায় দণ্ডায়মান হলেন। ইমাম হাসান হুসাইন তাদের গৃহের দরজায় পোটলা হস্তে জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান।

তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ) আদরের পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান হুসাইনকে পোটলাটি হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমাদের ঈদের জামা কাপড়। ইমাম হাসান হুসাইন মনের আনন্দে পোটলাটি হাতে নিয়ে মায়ের কাছে দিয়ে বললেন, মা জনৈক ব্যক্তি আমাদের ঈদের জামা কাপড় দিয়ে গিয়েছে, যাইহোক নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) পোটলাটি হাতে নিয়ে খুলে দেখলেন, ইহা বেহেশতী পোশাক। এবারে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা তার প্রার্থনা কবুল করে জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে নতুন জামা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে। সত্যি, পোটলার মধ্যে নতুন জামা কাপড় পেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) খুশি হলেন। এর পরে হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজ হাতেই পুত্র ইমাম হাসান হুসাইনকে বেহেশতী পোশাক পরায়ে দিলেন। ইমাম হাসান হুসাইন নতুন জামা পরিধান করে মনের আনন্দে নিয়ে বাইরে গেলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) কিভাবে বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাই একথা সর্বজন বিদিত যে আল্লাহ তায়ালা সকল বিপদ আপদ হতে মুক্তি দেন। তাই তো বলা হয়ে থাকে যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায় তার সকল কাজ কর্ম বিপদ আপদ সকল কিছুই আল্লাহ তায়ালা যিম্মাদর হয়ে যায়। আমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্যে চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের জীবনে কোন পেরেশানি থাকবে না বরং জীবন হবে ফুলের মত পবিত্র।

জিহাদের ময়দানে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ভূমিকা

আরব ভূ-খণ্ডের দুর্ধর্ষ বীর জাতি নর-নারী নির্বিশেষ অস্বারোহণ, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি যুদ্ধ বিদায় তাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল। যে পর্যন্ত ইসলামের পর্দা প্রথা প্রবর্তিত হয়নি ততদিন পর্যন্ত ঈমানে দীপ্ত দীপ্তিয় মান মুসলমান রমণীগণ যুদ্ধ করার অধীর আগ্রহে জিহাদে ময়দানে যেত। তবে রমণীদের জন্যে নির্ধারিত কোন যুদ্ধের স্থান ছিলনা তারাও পুরুষের সাথে যুদ্ধের ময়দানে দণ্ডায়মান হয়ে সমভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তারা অনেক সময় পুরুষ যোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা ও আহত সৈনিকদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল ঐ সময় মুসলীম রমণীদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল। কেননা ঐ সময় ধর্ম যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যগণের তুলনায় বিপক্ষ সৈন্য বাহিনী হতে এতই নগণ্য ছিল তাদের মুসলিম নারীদের সাহায্য সহযোগিতা অতীব প্রয়োজন ছিল। এ দিক হতে মুসলিম রমণীদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করাও শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য হত। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এই দিক থেকে কোন নারীর পশ্চাতে ছিলেন না। ইতিহাস পাঠে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে ঐতিহাসিক ওহুদ যুদ্ধের এ পর্যায়ে মুসলিম সৈন্য কাফেলা যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়নে, বহু সংখ্যক বীর মুজাহিদ হতাহত হয়ে গেলেন, কেবল বীর মুজাহিদ হতাহত হলেন তা নয় বরং নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাঠে পড়ে রইলেন। ঐ মুহূর্তে নারী কুলর শিরমনি হরযরত ফাতেমা (রাঃ) বেশ কিছু মুসলিম রমণী নিয়ে যুদ্ধে গমন করে আহত মুসলিম সৈন্যদের সেবায় নিয়োজিত হলেন। নবী করিম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়ে সংজ্ঞাহীন পিতা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র মস্তক মোবারক নিজের কোলে তুলে নিয়ে তার পবিত্র চেহারার রক্ত নিজ হাতে ধৌত করে দিলেন এবং আহত স্থান নিজেই বেঁধে দিলেন। এছাড়া তিনি যুদ্ধের ময়দানে আহত মুসলিম সৈন্যদেরকে হযরত আলীকে (রাঃ) নিয়ে সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। এমনি বহু বর্ণানায় দেখা যায় হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রয়োজনে অনেক সময়ই যুদ্ধের ময়দানে যেতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর অন্য রূপ

শাম দেশের এক আমীরের এক মেয়ে নাম ছিল ফাতেমা। জ্ঞানে ও গুণে দান খয়রাতসহ তিনি সারা শাম দেশের অধিবাসীদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাম দেশের ছোট বড় সকলেই তাকে একনামে চিনত। কোন এক সময় কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তার কানে নবী করিম (সাঃ-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমার কথা পৌছল। তিনি লোকজনের মাধ্যমে জানতে পারলেন নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) সর্বগুণে গুণান্বিত বটে তবে খুবই অস্বচ্ছল। তবে তার বিশেষ গুণ হল তার কাছে যখন যে হাদিয়া আসত তা তিনি গরীব দুঃখীদের মাঝে মাঝে বিলীন করে দিতেন। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে কেহ তার কাছে কোন কিছু খাবার চাইলে) জর গৃহে না থাকলেও অন্যের গৃহ হতে এনে দিতেন। এটা ছিল তার বিশেষ গুণ।

তিনি সর্বদা ত্যাগের মধ্যেই শান্তি খুঁজে পেতেন ভোগ না করে। ফাতেমা (রাঃ) এর গুণ গরিমা মহত্ব, চরিত্রের মহৎ আদর্শের কথা শুনে শাম দেশীনি ফাতেমা প্রতিহিংসা জ্বলে উঠল। আর জ্বলে উঠার কথাও। তার কথা হল এ শাম দেশের মধ্যে অন্যের সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এটা আমি চাই না এবং হতেও দিব না। একবার মনে মনে স্থির করল শাম দেশীনি ফাতেমা, নবী করিম (সাঃ) কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে স্বচোক্ষে দেখার।

মনের ইচ্ছা অনুযায়ী পিতার অনুমতি নিয়ে অনেক উপঢোকন ও দাসদাসীসহ হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে দেখার জন্যে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। সে মনে মনে ভাবছিল নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযত ফাতেমা (রাঃ) হতে এত সব দাস দাসীও উপঢোকন দেখে বিমোহিত হয়ে ঘাবড়ে যাবেন। শাম দেশী ফাতেমা যখন নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাছে যেয়ে পৌছল, তখন তিনি তাকে দেখে অত্যন্ত মর্যদার সাথে গ্রহণ করে নিলেন। আর আমার নেওয়া উপহারগুলো অতি আকর্ষণীয়ভাবে গ্রহণ না করে সাধারণ ভেবেই গ্রহণ করে নিলেন। তিনি ঘোড়ার জিন হতে আমার মূল্যবান উপঢোকনগুলি সরিয়ে রেখে নিজেই আমাদের মেহমানদারী করালেন। এর পরে তিনি লোক মারফত প্রতিবেশী গরীব দুঃখীদের সংবাদ দিলেন এবং নিজ হাতেই অসহায় গরীব দুঃখীদের

মাঝে প্রাপ্ত উপঢোকন হতে খাদ্য দ্রব্য ও বস্তু ইত্যাদি বিলীন করে দিলেন। আর মূল্যবান মনি মুক্তা, হীরা জহরৎ বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিলেন। সত্যি নবী হযরত ফাতেমা (রাঃ) এমন দৃশ্য দেখে শাম দেশীনি ফাতেমা তার দিকে বিনযে তাকিয়ে রইলেন।

তখন নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হরযর পাতেমা (রাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বোন ফাতেমা, তুমি মনে কষ্ট নিও না, আমি তোমার উপঢোকনগুলো অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছি। তবে এসব গরীব অনাথদের মাঝে বিলীন করে দেয়ার কারণ হল প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তার ওপরই অধিকার থাকে। এর অধিক ভোগ করা আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে অবৈধ। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কার্যকলাপ ও কথা শুনে শাম দেশের আমীর কন্যা ফাতেমা অবাক হয়ে নিজের ভুল নিজেই ধরতে পারলেন এবং ঐ মুহূর্তেই নবী করিম (সাঃ) কন্যাকে বললেন হে সাইয়েদুন নেসা। আপনি আমার জন্যে খাস করে দোয়া করুন আমি যেন গোটা জীবন আপনার মহৎ আদর্শকে স্মরণ করে চলতে পারি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মিল

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চাল-চলন, কথা-বার্তা, বাচন-ভঙ্গি, উঠা-বসা পুরোপুরিভাবে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সাথে মিল ছিল। এমর্মে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং হাসান ইবনে আলী (রাঃ)-এর তুলনায় অধিক রাসূলুল্লাহ সাদৃশ্য অনুরূপ আছে অন্য আর কেউ ছিলনা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, চাল-চলন কথা-বার্তা উঠা বসা আদর্শ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর তুলনায় অধিক কাউকেই আমি রাসূলুল্লাহ করিম (সাঃ)-এর সাদৃশ্য দেখিনি। কোন কোন বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, হরত ফাতেমা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পবিত্র দরবারে এসে উপস্থিত হতেন, তখন আল্লাহর নবী করিম (সাঃ)-এর মনের খুশীতে দাঁড়িয়ে যেতেন, এবং তাকে চুম্বন করে নিজের স্থানে বসাতেন এবং ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে আল্লাহর নবী (সাঃ) উপস্থিত হলেও নবী কন্যা অনুরূপ করে তাকে ভালবাসতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মর্যাদা

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই বলেছেন, আমার কলিজার টুকরো হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমার দেহের অংশ। তাকে যে অসন্তুষ্ট করে সে যেন আমাকেই অসন্তুষ্ট করল। হাফেযে হাদীস ও জলিল কদর মহিলা সাহাবী উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী করিম (সাঃ)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কাউকেই আমি দেখেনি। যায়েদ ইবনে আরকান বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হাসান এবং হুসাইনের সঙ্গে যাদের যুদ্ধ ও বিবাদ রয়েছে আমারও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও বিবাদ থাকবে, কোন এক বর্ণনা থেকে জানা যায় কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাটির ওপর চারটি দাগ দিয়ে লোকজনকে বললেন এটা কি তোমরা বলতে পার? তখন উপস্থিত লোকজন বলে উঠল এ সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) ভাল জানেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, মরিয়াম বিনতে ইমরান এবং আছিয়া বিনতে মুয়াহেম, বেহেশতবাসী রমণীদের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি। উপরে বর্ণিত চারজন রমণীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে আরও বলা হয়েছে তোমাদের অনুকরণের জন্যে দুনিয়ার রমণীদের মধ্যে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, মরিয়ম বিনতো ইমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়াই যথেষ্ট। নবী করিম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে, আল্লাহ নবী (সাঃ) বলতেন, তোমার রাজি খুশীতে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালাও সন্তুষ্ট হন।

কোন এক বর্ণনা থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধ সফল প্রভৃতি স্থান হতে ফিরে সর্ব প্রথম মসজিদে গিয়ে শোকরানা দু'রাকাত নামায আদায় করে, সর্ব প্রথমেই হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর গৃহে যেতেন। তার পরে তার সন্তানদের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

একজন তাবে তাবেয়ী নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে জিজ্ঞসা করলেন, আল্লাহর নবী করিম (সাঃ) সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন কাকে? জবাবে তিনি বলেন মহিলাদের মধ্য হতে ফাতেমা

(রাঃ) আর পুরুষদের মধ্যে হযরত খাদিজা (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বাধিক প্রিয়তমা দুলালী। ইসলামের বীর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ) বেহেশেতের যুবকদের সরদার ইমাম হাসান হুসাইনের মা হবে বেহেশতী রমণীদের নেত্রী। রওয়াতুশ শোহাদ নামক গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদশ (আঃ) এবং বিবি হাওয়া (আঃ)-এর চির শান্তিময় বেহেশতে অবস্থানকালে কোন এক শুভক্ষণে মনের আনন্দে বেহেশতের উদ্যানে ভ্রমণ করতে ছিলেন। তখন কথা প্রসঙ্গে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) কে বলতেছেন, আমার মনে হয় রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালা তোমার চেয়ে উত্তম নারী আর সৃষ্টি করবেন না। এ মুহূর্তেই বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তায়ালা নির্দেশে হযরত জিব্রাইল ফেরেশতা এসে তাদেরকে ফেরদাউস নামক সর্বোত্তম বেহেশতের সর্বোত্তম কক্ষে নিয়ে যান, তথায় গিয়ে তারা চোখ ফেলতেই দেখতে পেলেন এক অতি উজ্জল লাবণ্যময়ী রমণী অনুপম পোশাকের সাজে সজ্জিত হয়ে মহা মূল্যবান আসনে বসে রয়েছেন। লাবণ্যময়ী রমণীর প্রতি চোখ ফেলা মাত্রই হযরত আদম (আঃ) জিব্রাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞসা করলেন এ ভাগ্যবতী লাবণ্যময়ী রমণী কে?

হযরত আদম (আঃ)-এর জবাবে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন ইনি হলেন নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা সুপারিশীর কাণ্ডারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)। তার পবিত্র মস্তকে যে মুকুট অবলোকন করতেছেন তিনি তার স্বামী ইসলামের বীর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ)। আর তার পবিত্র দুই কর্ণে যে দুটি উজ্জল রত্ন দেখতেছেন তারা ইহার দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়েন (রাঃ। হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর কথা শুনে হযরত আদম (আঃ) অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিব্রাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা দু'জনই তো মানব জগতে আদি তবে কখন তাদেরকে সৃষ্টি করা হল তার জবাবে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন তারা আখেরী যামানার আপনারই সন্তানদের মধ্যে থেকে জন্ম গ্রহণ করবেন। তবে একথা চিরন্তন সত্য যে আপনার জন্মের অনেক পূর্বে।

অন্য এক বর্ণনা হতে জানা যায় নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কোন এক সময় খিলাফতে রাশেদার প্রথম খলিফা মু'মিনদের মা বিবি আয়েশা (আঃ)-এর পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ওপর কোন এক কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর

(রাঃ) এমন কথা অনুধাবন করতে পেরে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড খাঁ খাঁ রোদ্রের মধ্যে দিয়ে নবীজীর কলিটার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহের দরজায় উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, নবী করিম (সাঃ)-এর আদরের হযরত ফাতেমা (রাঃ) যে পর্যন্ত আমার প্রতি খুশী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার গৃহে দরজা হতে যাব না। এমনি সময় হঠাৎ শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা শুনে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ে বিবাদের সমাধান করে দিলেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরেই হযরত ফাতেমা (রাঃ) সর্বোচ্চ জান্নাতে প্রবেশ করবেন। প্রিয় পাঠক একটু চিন্তা করে দেখুন হযরত ফাতেমা (রাঃ) কত উচ্চ পর্যায়ের ছিলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

প্রতিদিন মদীনা শরীফের অগিণত মহিলা, হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ)-এর নিকট তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ সমূহ শ্রবণের জন্যে আগমন করতেন। আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্যে তিনি আগত মহিলাদেরকে সাধারণতঃ যে সকল উপদেশ দিতেন, তার মধ্যে প্রধান প্রধান মূল্যবান উপদেশ সমূহ নিম্নে বিবৃত হল।

এই উপদেশসমূহ যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে মহিলারা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে কল্যাণময় ও শান্তিময় করতে পারে। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায একাগ্রচিত্তের সাথে আদায় করবে।
২. রমযান মাসের রোযা কখনো ছাড়বে না।
৩. দৈনিক কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে।
৪. স্বামীর খেদমতে নিজেকে সদা ব্যাপৃত রাখবে।
৫. ভোরে স্বামীর পূর্বে নিজে বিছানা ত্যাগ করবে।
৬. স্বামীর খেদমত করে বেহেশ্‌ত কামাই করবে।
৭. সদা-সর্বাদা স্বামীর সাথে হাসি মুখে কথা বলার চেষ্টা করবে।
৮. স্বামীর দুঃখ-কষ্টের ভাগী হবে।
৯. স্বামীর দোষ অন্বেষণ করা যেতে বিরত থাকবে।
১০. স্বামীর মনে কষ্ট পায় এমন কাজ করবে না।

১১. স্বামীর সামনে নম্র ও কোমল ভাষায় কথা বলবে।
১২. অপ্রয়োজনীয় আবদার করে স্বামীকে লজ্জা দেবে না।
১৩. স্বামীর সাধ্যের বাইরে কোন কিছু তাঁর নিকট চাইবে না।
১৪. কখনো স্বামীর অবাধ্য হবে না।
১৫. সাধ্যানুযায়ী শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করবে।
১৬. স্বামীর চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে না।
১৭. স্বামী ডাকা মাত্রই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হবে।
১৮. স্বামীকে সর্বদা খুশি রাখতে চেষ্টা করবে।
১৯. স্বামী ছাড়া অন্য (পর্দা করতে হবে) কারো সাথে হাসিমুখে কথা বলবে না।
২০. স্বামীর ঘরে কখনো জিদ ও হঠকারিতা করবে না।
২১. স্বামীর সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলবে না।
২২. স্বামীর প্রদত্ত কোন জিনিস পত্রে অসন্তুষ্ট হবে না।
২৩. স্বামীর খুশির জন্যে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বেশ-ভূষা করবে এবং সেজেগুজে বলবে।
২৪. স্বামীর সকল নিকট আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।
২৫. স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাউকে কিছু খাওয়াবে না।
২৬. নিন্দুকের নিন্দার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না।
২৭. অপরের দোষ তালাশ থেকে বিরত থাকবে।
২৮. সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
২৯. অসুস্থ ও পীড়িতদের সেবা করবে।
৩০. বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করবে না।
৩১. দুঃখীজনের প্রতি দয়া করবে।
৩২. কখনো কারো গীবত করবে না।
৩৩. কাউকে সামনে ধিক্কার দিবে না।
৩৪. প্রতিবেশীদের সাথে কখনো ঝগড়ায় লিপ্ত হবেনা।
৩৫. কখনো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না।
৩৬. বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে।
৩৭. দুঃখ-কষ্ট পড়ে আল্লাহর প্রতি কটোক্তি করবে না।
৩৮. আল্লাহর সাথে কো কিছুর অংশীদার করবে না।

৩৯. সদা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর বিশ্বাস রাখবে।
৪০. তাক্‌দীরকে কখনো গালি দেবে না।
৪১. বিস্‌মিল্লাহ বলে সকল কাজ শুরু করবে।
৪২. প্রত্যেক কাজের শেষে আল্লাহর শোকর আদায় করবে।
৪৩. কোন দুঃখের সংবাদ শুনলে 'ইন্নালিল্লাহে-ওয়া-ইন্না ইলাইহে রাজেউন' বলবে।
৪৪. কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না।
৪৫. সর্বদা মনে মনে যিকির করবে।
৪৬. কবরের শাস্তির কথা স্মরণ রাখবে।
৪৭. পরকালের কথা স্মরণ রাখবে।
৪৮. পর্দাই নারীর ভূষণ।
৪৯. বেগানা পুরুষের সাথে কখনো একাকী বসবে না। কখনো ব্যভিচার বা যিনায় লিপ্ত হবে না।
৫১. বড়দের অবশ্যই শ্রদ্ধা করবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত ফাতেমা (রাঃ)

বিশ্বনবী হরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার আদরের কন্যা কলিজার টুকরো হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও তার স্বামী ইসলামের বীর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ) কে ও তাদের সন্তান কলিজার টুকরো ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) কে অত্যাধিক ভালজানতেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলীকে (রাঃ) তো ভালবাসতেনই তার চেয়েও তাদের কলিজার টুকরো সন্তানদেরকে বেশি ভালবাসতেন। তাদেরকে কলিজার টুকরো বলেই মনে করতেন। তাদেরকে খুশি করার জন্যে তাদের সাথ অনেক রং তামাশা করছেন। এমনকি অনেক সময় ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) কে পিঠে নিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলতেন।

এক বর্ণনায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোন এক সকালে প্রিয় নবী (সাঃ) পশমী একটি চাদর পড়ে ছিলেন। এমন মুহূর্তে হঠাৎ করে ইমাম হাসান, হুসাইন, নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) নবীর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) তার নিকটে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখেই আল্লাহর নবী (সাঃ) মনের খুশীতে তাদের সবাইকে চাদরের ভেতর টেনে নিলেন, তারপরেই তার পবিত্র মুখ হতে বের হয়ে আসল রাহমানুর

রাহীম আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হতে অপবিত্র তা দুরীভূত করুন এবং তোমাদেরকে সৎ ও পবিত্র পথে চলার ক্ষমতা প্রদান করুন। অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা কোন এক মুহূর্তে আল্লাহর নবীর নিকট রাসূল পত্নী সকলেই বসাছিলাম এমনি সময় দেখতে পেলাম হঠাৎ করে হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত হেঁটে হেঁটে হাজির হলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে দেখা মাত্রই মনের খুশীতে মারহাবা বলে তার ডান অথবা বাম পার্শ্বে বসালেন। শুধু বসালেনইনা তার কানে কানে কি যেন বললেন।

তারপরই নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কেঁদে দিলেন। আল্লাহর নবী (সাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর কান্না ও অস্থিরতা দেখে পুনরায় ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন, ফাতেমা (রাঃ) মনের খুশীতে হাসতে লাগলেন। এই মুহূর্তে আমি নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করল সকল স্ত্রীলোকদের মধ্যে হতে আল্লাহর নবী তোমাকে ডেকে কি যেন বললেন আর তুমি কেঁদে উঠলেন এর মূল কারণ আমাকে বল? আল্লাহর নবী করিম (সাঃ) যখন এখান হতে চলে গেলেন তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন আমি কোন ক্রমেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোপন কথা ফাঁস করব না। সাইয়েদুল কাওনাইন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইহধাম ত্যাগের পরে আমি নবী কন্যা হযরত ফতেমা (রাঃ) কে জিজ্ঞসা করলাম তোমার কাছে অধিকার নিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আশা করি অধিকারের যথার্থ মর্যাদা তুমি রাখবে।

তিনি অন্ধকারে বসে যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দের সঙ্গে আলো বিচ্ছুরিত হতো। আর সে আলোয় অন্ধকার হতো আলোকোজ্জ্বল। এইজন্য তাঁকে 'নূরী' উপাধি দেওয়া হয়। বনের মধ্যেতাঁর একটি ক্ষুদ্র সাধনালয় ছিল। সেখানে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ঐ ঘরে পদার্পণ করা মাত্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

তিনি দারিদ্র্য ও সাধকত্বের চেয়ে ত্যাগ ও উৎসর্গের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। প্রথমে পরের উপকারের কর, পরে নিজের॥ এই ছিল তাঁর শিক্ষানীতি। তিনি বলতেন, সাধকদরবেশের সঙ্গ ও শিক্ষা-গ্রহণ করা ফরজ। নির্জনবাস তাঁর খুব একটা পছন্দ ছিল না। তাঁর মতো উপাসনানিষ্ঠ আর কেউ নেই বলে একবার আবু আহমদ মাগবেরী মন্তব্য করেন। হযরত জুনায়েদ

(রঃ)-এর নামোল্লেখ করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, তিনিও নন।

হযরত আবুল হাসান (রঃ) প্রথম জীবনে ব্যবসা করতেন। তাঁর একটি দোকান ছিল। বাড়ি থেকে তিনি নিয়মিত খাবার নিয়ে যেতেন দোকানে। কিন্তু নিজে না খেয়ে পথেই তা বিলিয়ে দিতেন। অথচ,তাঁর দোকান ছিল প্রায় বিশ বছর। আর তাঁর বাড়ির কেউ জানতেন না যে, নিজে খাবার না খেয়ে তিনি সবকিছু দান করে দেন।

একবার তিনি বলেন, তাঁর কয়েক বছরের সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। মহান নবীগণের উপদেশাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়, তাঁর সাধনার মধ্যে হয়তো অহমিকার ছোঁয়া লেগেছে। পরে তিনি নিশ্চিত হন যে, সত্যিই তাঁর আত্মা রিপু কবলিত। অবশেষে তিনি রিপুর বিরুদ্ধে উঠে পড় লাগলেন। আর তখন থেকে কিছু কিছু গূঢ়তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হতে থাকে। রিপুর কোন ইচ্ছাই আর পূর্ণ হয় না। তারপর তিনি দজলা নদীতে মাছ ধরার ফাঁদ পেতে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, যতক্ষণ না ফাঁদে মাছ পড়ছে, তিনি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। আল্লাহ্ তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন। প্রচুর মাছ আটকা পড়ল। আর এই বৃত্তান্তটি পেশ করলেন হযরত জুনায়েদ (রঃ)-এর দরবারে। জুনায়েদ (রঃ) বললেন, মাছের বদলে সাপ ধরলে নিশ্চয়ই তাকে অলৌকিক কাণ্ড বলা যেত। তুমি এখন তরীকতের মধ্যম মি লে। অতএব এটিকে অলৌকিক না বলে প্রতারণা বলতে হবে।

তিনি তখন খ্যাতির তরঙ্গে। সেই সময় বাগদাদের এক তরুণ তরীকতপন্থীদের পেছনে লাগল। এঁদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল রাজ-দরবারে। তার অভিযোগ ছিল, এরা গান গায়, নাচে, বাজে বাজে কথা বলে এদের গান ও গজলের ভাষায় ধর্মশূন্যতার পরিচয় প্রকাশ পায়। অতএব নিঃসন্দেহে এরা কাফের, মুশরিক। এদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হলে তা হবে একটি পুণ্য কর্ম। আল্লাহ্ তার পুরস্কার দেবেন।

খলিফা তাঁদের–যথা হযরত জুনায়েদ (রঃ),হযরত আবু হামযা, হযরত রোকাম (রঃ), হযরত শিবলী (রঃ), হরযত নূরী (রঃ) প্রমুখকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হল। সবাইকে হাজির করা হল দরবারে। আর খলিফা তাঁদের প্রাণদণ্ড দিলেন।

বধ্যমঞ্চে প্রথমে আনা হল হযরত রোকাম (রঃ)-কে। কিন্তু হযরত নূরী

(রঃ) তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দাঁড়িয়ে গেলেন বধ্যমঞ্চে। সবাই তাজ্জব। জল্লাদ কর্কশ কণ্ঠে বললে, তরবারি খুব প্রিয় জিনিস নয়, তার তলায় আসার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। তোমার পালা এখনও আসেনি। তুমি সরে যাও। সময় হলে ঘাড় পেতে দিও।

হযরত নূরী (রঃ) বললেন, আমাদের রীতি হল নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া, প্রয়োজনে প্রাণও উৎসর্গ করা। পৃথিবীতে প্রাণই সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। তাই নিজের প্রাণ দিয়েযদি অন্যের প্রিয়বস্তুকে কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা করা যায়, তাহলে আমরা পিছিয়ে না গিয়ে এগিয়ে যাই। এইজন্য আমি আমার তরীকতের বন্ধুর স্থলে উপনীত হয়েছি।

এরপর কাজী হযরত নূরী (রঃ)-কেও একটি প্রশ্ন করলেন। আর তার উত্তরও পেয়ে গেলেন, তৎক্ষণাৎ। বলা বাহুল্য, কাজী এবার লজ্জিত হলেন। এবার কাজীকে প্রশ্ন করলেন হযরত নূরী (রঃ)। আপনি এসব কি জেরা করছেন? আসল কথা তো জিজ্ঞেস করলেন না? শুনুন, দুনিয়াতে এমনও আল্লাহর দাস রয়েছেন, যারা আল্লাহর ভয়েই ভীত। যাদের জীবন-মরণ, নিদ্রা-জাগরণ সবই আল্লাহতেই। আল্লাহ্ দর্শন থেকে মুহূর্তের জন্যও বঞ্চিত হলে তাঁরা মৃতবৎ হয়ে যান। তাঁরা আল্লাহর কাছেই শুয়ে থাকেন। তাঁর দ্বারাই পানাহার করেন। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছেই চান। এগুলিই হল প্রকৃত জ্ঞান ও বিদ্যা। আপনি যা জিজ্ঞেস করলেন, তা কোন জ্ঞানের বিষয় নয়। কাজী এ কথা শুনে দিশেহারা হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি খলিফাকে জানিয়ে দিলেন, এসব লোক যদি বিধর্মী হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে বলতে হয়, দুনিয়াতে একজনও তওহীদবাদী নেই।

কাজীর কথা শুনে খলিফা দরবেশগণকে আবার দরবারে ডাকলেন। এবার যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, আপনাদের কিছু কাম্য থাকলে আমাকে বলুন। তাঁরা সবাই বললেন, আমাদের কাম্য এই যে, আপনি আমাদের কথা ভুলে যান। আমাদের অন্তরে গ্রহণ না করে পৃথক করে দেওয়াই আমাদের জন্য উত্তম।

খলিফা এ ধরনের উত্তর শুনে খুবই অনুতপ্ত হলেন। কাঁদলেনও। তারপর সসম্মানে তাঁদের বিদায় জানালেন।

একদিন হযরত নূরী (রঃ) দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়া কালীন

দাড়ির মধ্যে হাত বুলাচ্ছে। তিনি বললেন, আল্লাহর দাড়ি থেকে তোমার হাত দূরে রাখ। আর কেউ খলিফার কাছে নালিশ করল যে, হযরত নূরী (রঃ)-এর ধরনের কুবাক্য বলেছেন। খলিফা হযরত নূরী (রঃ)-কে বললেন, আপনি এ ধরনের কথা বলেন কেন? হযরত বললেন, দাসের ওপরে আল্লাহর অধিকার। সে হিসেবে দাসের অঙ্গ-প্রতঙ্গও তাঁর। অতএব বান্দার দাড়িকে আল্লাহর দাড়ি বলল অন্যায় বলা হয় না। খলিফা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এইজন্য যে, তিনি তাঁকেকোতল করার হুকুম দেননি।

একবার হযরত নূরী (রঃ) হযরত জুনায়েদ (রঃ)-এর তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বর সমাধান জানতে চাইলেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে দীঁ ত্রিশ বছর। আর তাতে তিনি জর্জরিত, শক্তি ও উদ্যমহীন। দ্বন্দ্বটি হল এই যে, যখন প্রভু থাকেন । এ নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে বহু কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয়, রোধ-উপরোধ করেছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। তাঁর ঐ এক কথা। হয় তুমিথাকবে, না হয় আমি। তাঁর কথা শুনে হযরত জুনায়েদ (রঃ) তাঁর শিষ্যদের বললেন, যদি আল্লাহর প্রেমে, ভাবনায় বিভোর কাউকে দেখতে চাও তো হযরত নূরী (রঃ)-কে দেখে নাও। অতঃপর হযরত নূরী (রঃ)-এর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার এরূপ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ প্রকাশিত হোন বা গোপন থাকুন, কোন অবস্থায়ই আপনি থাকবেন না, কেবল তিনিই থাকবেন।

একবার কয়েকজন লোক এসে হযরত জুনায়েদ (রঃ)কে খবর দিলেন যে, হযরত নূরী (রৎ একখণ্ড পাথরের ওপর বসে শুধু নামাজের সময় হলে উঠে গিয়ে নামাজ পড়ছেন। হযরত জুনায়েদ (রঃ) বললেন, তিনি ফানার স্তরে (বেহুঁশ অবস্থায়) নেই, বরং এর দ্বারা তাঁর চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, অচৈতন্য হলে তাঁর নামাজের খেয়াল থাকত না। তিনি আরও বললেন, তিনি প্রথত্ত হয়ে আছেন। এ অবস্থায় তিনি নিশ্চেতনায় ডুবে থাকলেও আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখেন। যাতে করনীয় কর্তব্য থেকে তাঁর বিচ্যুতি না ঘটে। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, যদি জানতাম যে চিৎকার করে লাভ হয়, তবে আমি তাই করতম। আপনি চুপ থেকে খুশি থাকুন। হযরত নূরী (রঃ) নীরব হলেন। বললেন, আপনিই আমার উত্তম শিক্ষক।

এক ইস্পাহানী তরুণ হযরত নূরী (রঃ)-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য খালি পায়ে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে হযরত নূরী (রঃ) তাঁর তরুণ ভক্ত আসছেন

খালি পায়ে। তরুণ তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছ? তিনি বললেন, ইস্পাহান থেকে। হযরত বললেন, যদি ইস্পাহানের বাদশাহ হাজার দীনার ব্যয়ে তোমার জন্য এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করতেন ও হাজার দীনার মূল্যের এক রূপসী দাসী কিনে আরও মূল্যবান সামগ্রী সহ তোমাকেউপঢৌকন দিয়ে বলতেন, তুমি যে উদ্দেশ্যে বাগদাদ যাচ্ছ, তা ত্যাগ কর তাহলে সে সব ছেড়ে আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা কি তোমার বহাল থাকত?

আসলে কিন্তু এই ব্যাপারই ঘটেছিল। ইস্পাহানানের বাদশাহ তাঁকে এরূপ প্রস্তাবই দিয়েছিলেন। কিন্তু যুবক সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বাগদাদে চলে আসেন। কিন্তু সেটি কী করে হযরত নূরী (রঃ) জেনে ফেলেছেন ভেবে তরুণ সত্যিই বিস্মিত হলেন। কোন রকমে বললেন, ও কথা বলে আমাকে আর অপ্রস্তুত করবেন না। হযরত নূরী (রঃ) বললেন, খাঁটি মুরীদ এরূপই হয়। সমগ্র বিশ্ব উপহার দিলেও যিকিরের বিনিময়ে তাঁরা তা গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হন না।

একবার একটি লোকের বিপুল কান্না দেখে তিনিও কাঁদতে শুরু করেন। তারপর লোকটি চলে গেলে তিনি বললেন, এই লোকটি ইবলীস। সে নিজের উপাসনার উল্লেখ করে এমনভাবে কাঁদতে লাগল যে, আমিও না কেঁদে পারলাম না

একবার কাবাঘর তওয়াফ কালে তিনি প্রার্থনা করেন, তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যের যেন কোন পরিবর্তন না হয়। তখন দৃশ্যবাণী শব্দিত হয় এই মর্মে যে, একমাত্র আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় না। সেটি তাঁর নিজস্ব বিশেষ ব্যাপার। কিন্তু দাসদের তা হয়। না হলে তাদের দাসত্ব কিংবা আল্লাহর প্রভুত্ব প্রকাশিত হয় না। তিনি কি আল্লাহর তুল্য হতে চান?

আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার কানে কানে গোপনে যা বলেছিলেন তা আমাকে অবশ্যই জানাবে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জবাবে বললেন, হ্যাঁ এখন বলা যেতে পারে। নবী (সাঃ) কন্যা ফাতেমা বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম বারে আমার কানে কানে বলেছিলেন, হযরত জিব্রাঈল ফেরেশতা প্রতি বছর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কোরআনের অংশটুকু একবার পাঠ করেন। কিন্তু এবার দুইবার পাঠ করেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর সময় খুবই নিকটে বিধায় হে মা

ফাতেমা (রাঃ) তুমি সর্ব ক্ষেত্রেই বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে। মনে রাখবে তোমার জন্যে আমিই কেঁদে দেই। আমার অস্থিরতা এবং ক্রন্দন দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে পূর্বের ন্যায় কানে কানে বললেন হে মা ফাতেমা, তুমিই তুমিই একমাত্র আহলে বাইতের মধ্যে হতে সর্ব প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে এবং বেহেশতী রমণীদের মধ্যে তুমিই সর্দার হবে।

হযরত মা ফাতেমা (রাঃ)-প্রায়ই ওয়াজ করতেন পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আল্লাহ্ নিজেই সন্তুষ্ট হন

পিতা-মাতার অধিকার অস্বিকার করে আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করা যায় না। যারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ-উদ্রেককারীরা আল্লাহর গজব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

"হযরত জাহিমার (রাঃ) পুত্র হযরত মুয়বিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এ জন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? জাহিমা (রাঃ) বললেন, জ্বী। আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি জীবিত আছেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের নিচেই বেহেশত।" [ইবনে মাজা, নাসায়ী]

"তাঁর পায়ের নিচেই বেহেশত" কথাটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ হলো, তাঁকে পুরোপুরি সম্মান এবং আচার-আচরণে অত্যন্ত বিনয় দেখাতে হবে। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর খিদমত ও এ খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে।

উপরের হাদীসে পিতার অনুগত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রধান এবং এ হাদীসে মাতার আনুগত্য ও খিদমতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীস

দুটিতে পিতা-মাতা উভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত জাহিমা (রাঃ) স্বয়ং বলেছেন, আমি হুযুর (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদে অংশগ্রহণ আমার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে আমি আপনার মত জানতে চাই। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা (জীবিত) আছেন? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। আল্লাহর প্রশংসা, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, যাও, তাদের খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তঁদের পায়ের নীচেই বেহেশত রয়েছে।

"হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণীত আছে তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক। আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথবা কোন একজনকে অতপর তাদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

"হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি প্রিয় নবী (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বললো, জ্বী হাঁ। বরং আল্লাহর প্রশংসা যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, জ্বী হাঁ। আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। নবী করীম (সঃ) বললেন, তাহলে পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।" (মুসলিম)

দ্বীনের হিজরত ও জিহাদের যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না এ সত্বেও যদি পিতা-মাতা বার্ধক্য, দুর্বলতা অথবা কোন মাজুরীর কারণে সন্তানের সাহায্য ও খিদমতের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে সন্তান তাঁদের খিদমত এবং আরাম প্রদান করে আল্লাহর প্রতিদানের আকাংখী হবে। আর তাতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুস্টি। এ ধরনের অসহায় অবস্থায় ইসলামে পিতা-মাতার সান্নিধ্যে থেকে খিদমত করা হিজরতও জিহাদের মত উত্তম আমলের চেয়েও অতি উত্তম কাজ হিসাবে আখ্যায়িত কারা হয়েছে।

হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোন পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি। নবীজ (সঃ) বললেন, জ্বী হ্যাঁ। চারটি অবস্থা রয়েছে (১) পিতা-মাতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার, (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমুহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ, (৩) পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের ইজ্জত ও খাতিরদারি ও (৪) তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা পিতা-মাতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন।" (আল-আদাবুল মাফরুজ)

পিতা-মাতা শিশু লালান-পালন এবং প্রশিক্ষণের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন এং দিবা-রাত্রি তত্ত্বধান করেন। সত্য কথা হলোঃ আপনি যদি জীবনভরও দাস-দাসীর মত তাঁদের খিদমত করতে থাকেন, তবুও তাঁদের খিদমতের হক আদায় হতে পারে না। এ কারনেই একজন মু'মিন সারা জীবন পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে থাকে। কিন্তু যখন পিতা-মাতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখনো চিন্তা করতে থাকেন যে, হায় আমি তো কিছুই করতে পারিনি। আর এ জন্যেই তিনি তাঁদের মৃত্যুর পর তঁদের রুহুকে খুশী করার জন্য কোন পন্থা কামনা করেন। এ ধরনের মু'মিনের প্রাণের আবেগ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন জনৈক ব্যক্তি। তিনি জবাবে বলেছিলেন, মৃতুর পরও তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা যায় এবং এ আচরণের পদ্ধতিসমুহ বর্ণনা করে দেন।

দোয়া ও ইসতিগফারঃ নামাযের পর এবং অন্য সময় আল্লাহর নিকট কেঁদে দোয়া করুন যে, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন। তঁদের গুনাহসমুহকে ঢেকে দিন এবং তঁদেরকে আপনি তাই দান করুন যা আপনি নেক বান্দাহ-বান্দীকে দিয়ে থাকেন। হে আল্লাহ! যখন আমরা তাঁদের সাহায্যে, স্নেহ ও লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম তখন তারা সব কিছু আমাদের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন। পরওয়াদিগার! এখন তাঁরা তোমার নিকট সমুপস্থিত। শৈশবকালে অসহায় অবস্থায় আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষি ছিলাম। এখন তাঁরা সেই সময়ের চেয়ে বেশি তোমার রহমত ও সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী। পরওয়ারদিগার! তুমি তাঁদেরকে নিজের রহমতের ছায়া দান কর এবং নিজের সন্তুষ্টির ঘরে তাঁদের আশ্রয় দাও।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পর যখন মাইয়েতের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কেমন করে হলো? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মারা যান তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বস্তু এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার করতে থাকে। প্রথম, সদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয় তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয় সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হযরত ইবনে শিরীন (রঃ) একজন মশহুর বুর্জগ তারেয়ী ছিলেন। তিনি একটি কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এক রাতে আমরা হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে পরওয়ারদিগার! আবু হুরায়রাহ কে ক্ষমা কর এবং হে পরওয়ারদিগার ! আবু হুরায়রাহ'র মাতাকে ক্ষমা কর এবং হে পরওয়ার দিগার! তাদের সবাইকে ক্ষমা কর, যারা আবু হুরায়রাহ এবং তার মাতার ক্ষমার জন্য দোয়া করে। হযরত ইবনে শিরীন (রাঃ) বলেন, আমরা আবু হুরায়রাহ (রাঃ) এবং মাতার পক্ষে ক্ষমার দোয়া করতে থাকি যাতে আমরা আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর দোয়ার সামিল থাকি।

পিতা-মাতার ওয়াদা ও ওসিয়ত পুরণ করাঃ পিতা-মাতা জীবিত অবস্থায় অনেক লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। বিভিন্ন ব্যাপারে কিছু ওয়াদা করতে পরেন। মৃত্যুর সময় কিছু ওসিয়ত করতে পারেন।

পিতমাতার ইন্তেকালের পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর বা নেক আচরণের একটি প্রস্থা অবশিষ্ট থাকে। তাহলো তাঁদের কৃত ওয়াদাসমুহ ও ওসিয়ত পূরণ করা। জায়েয বা বৈধ ওসিয়তই পূরণ করতে হবে। যদি তঁদের অবৈধ ওসিয়তই পূরণ করতে হবে। যদি তাঁদের অবৈধ ওসিয়তও পূরণ করা হয় তাহলে এটা তঁদের সাথে নেক আচরণ হবে না বরং খারাপ আচরণ হবে।

পিতা-মাতা যদি কারোর সাথে আর্থিক সাহায্য দানের ওয়াদা করে থাকেণ অথবা কাউকে কিছু দান করতে চেয়ে থাকেন। আর জীবনে যদি

তার সুযোগ না পান অথবা তাঁরা কোন মানত করেছিলেন, কিন্তু তা পূরণের আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। অথবা তিনি ঋণী ছিলেন অথবা ওসিয়াত করার সুযোগ পাননি, অথচ আপনি বুঝেন যে সুযোগ পেলে তিনি অবশ্যই এ ওসিয়ত করতেন অথবা তিনি কোন ওসিয়ত করেননি। আপনি যদি তাঁদের পক্ষ থেকে সাদকাহ করেন তা হলে এইসব তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে। আর এভাবেই তঁদের ওফাতের পরও আপনি জীবনভর তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোন ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সাদকাহ করি তাহলে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? প্রিয় নবী (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এ বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) রাসূলুলাহ (সাঃ) এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা মানত মেনেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ওফাত পেয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি? হুযুর (সঃ) ইরশাদ করলেন, কেন পারবে না। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

তিন ঃ মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে আচরণঃ পিতা-মাতার ওফাতের পর তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হলো, সামাজিক জীবনে বুজর্গ ব্যক্তিদের সাথে নেক বা সুন্দর আচরণ করা। সামাজিক জীবনে বুজর্গ ব্যক্তিদের মত তাঁদেরকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। তঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন প্রশ্নে পরামর্শের সময় তাঁদেরকে শরীক করা এবং সব সময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আবশ্যক।

অতপর তিনি যখন বাইরে থেকে আসতেন এবং ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তেমনিভাবে মাতাকে সালাম করতেন ও একই কথা বলতেন।

"হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম-আহকাম এবং হেদায়েত মানা অবস্থায় সকাল করলো। যদি

পিতা-মাতার মধ্যে কোন একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা হবে। যদি পিতমাতার মধ্যে কোন একজন থাকেন, তাহলে যেন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি মাতা-পিতা তার সাথে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও।" (মিশকাত)

নবী করীম (সঃ) পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ দানের জন্য এ ধরণের বর্ণনা পদ্ধতি আবলম্বন করেছেন। ফলে একজন মু'মিনের সামনে এ তাৎপর্য পরিষ্কার হয় যে, আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্যেই হওয়া উচিত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য বৈধ নয়। পিতা-মাতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণও এজন্য যে, আল্লাহ পিতমাতার অধিকার বর্ণনা করেছেন এবং তা মেনে চলার ও খিদমতের নির্দেশ দিয়েছেন। মু'মিন ব্যক্তি এমন কোন ব্যাপারে অবশ্যই পিতা-মাতার আনুগত্য করবে না যাতে আল্লাহর নাফরমানী হয়।

পিতা-মাতার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সুন্দর আচরণের অর্থ হলো, যদি মাতা-পিতা কঠোর মেজাজের কারণে এমন সব দাবী করতে থাকেন, যা পূরণ করা সন্তানদের জন্য কঠিন হয় অথবা সন্তানদের কষ্টের কথা চিন্তা না করে বেশি বেশি পরিশ্রম করতে থাকেন অথবা সন্তাদের সামর্থের বাইরে অতিরিক্ত আর্থিক দাবী করতে থাকেন তাহলেও সন্তানদের উচিত নিজেদের আবেগ দাবিয়ে রেখে এবং জোর করে তাদের খিদমত ও সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখা।

এ অবস্থায় যদিও সন্তানের উপর আনুগত্য ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ কারোর উপর সাধ্য বা সামর্থের বেশি বোঝা আরোপ করেন না, তবুও পিত-মাতার আনুগত্যের এটাই চূরান্ত রূপ। সন্তান নিজের সামর্থের বাইরে পিতা-মাতাঁর খিদমতে নিজের জীবন বিলিয়ে দেবে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখাও আরাম প্রদানের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করবে।

হ্যাঁ, যদি এমন দাবী করেণ যাতে অন্যের অধিকার খর্ব হয়, অথবা তার বিস্বাদপূর্ণ প্রভাব অন্যের উপর আপাতিত হয় অথবা আল্লাহর কোন হুকুমের

বিরোধিতা হয় তাহলে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে না। উদাহরণ স্বরূপ,

তারা যদি কারোর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে বাধা দান করে অথব নিজের ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা জিদের বশবর্তী হয়ে কন্যাকে বিনা কারণে এমন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনে বাধ্য করতে চায় যে স্ত্রীর শরীয়তের অধিকার আদায়ে কার্পণ্য করে না। অথবা এ ধরনের স্বামীর খিদমত ও আনুগত্যে বাধা দেয়। তাহলে এ ধরনের পিতা-মাতার আনুগত্য অবশ্যই ওয়জিব নয়। কেননা অন্যের অর্থনৈতিক অধিকার আদায় ফরয এবং তা না করা মারাত্মক গুনাহর কাজ। হকদার যদি ক্ষমা করে তাহলেই শুধু আল্লাহ এ ধরনের গুনাহ মাফ করে থাকেন।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, "যদি একজনের আনুগত্য হয় তাহলে জান্নাতের এক দরজা খোলা থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, পিতা-মাতার মধ্যে যদি কেউ ইন্তিকাল করেন এবং এখন আর তার আনুগত্যের ও খিদমতের সুযোগ নেই, তাহলে এ ধরনের সন্তানের জন্য একটি দরজাই খোলা রয়েছে, বরং তারা মর্মার্থ হলো, যদি পিতা-মাতার মধ্যে থেকে একজনের আনুগত্য করেছে এবং অন্য জনকে অসন্তুষ্ট রেখেছে তাহলে একজনের আনুগত্যের জন্য বেহেশতের দরজা খোলা রয়েছে এবং অন্যের নাফরমানীর জন্য দোজখের দরজা খোলা রাখা হয়েছে। যদি উবয়ের মধ্য থেকে একজন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এবং জীবিতাবস্থায় তার আনুগত্য করা হয়েছে তাহলে এ আনুগত্যের বিনিময়ে খোলা দরজা খোলাই থাকবে তা বন্ধ করা হবে না।

হাদীসটিতে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কেউ একজনের আনুগত্য করে এবং অন্যজনকে নিজের কাজের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট রাখে তাহলে তা সঠিক নয়। একজনের আনুগত্যের কারণে আল্লাহর জান্নাতের দরজা খুলে রাখেন। কিন্তু অন্যজনের নাপরমানীর কারণে স্বয়ং জাহান্নামের দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। একজনের আনুগত্য করে অন্যজনের খিদমত ও আনুগত্য প্রশ্নে নিশ্চিত থাকা কোন মু'মিনের সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। যেতো উভয়ের খিদমত ও আনুগত্য করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।

সামাজিক জীবনে পিতা-মাতার অধিকারের গুরুত্ব এবং তাদের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাকিদ দেয়া সত্ত্বেও কখনো এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয়

যে, আপনি তাদের আনুগত্যের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন। তাদের কথা পাশ কাটিয়ে শরীয়তের দাবী পূরণে সক্ষম হতে পারেন। ইসলামে আনুগত্য প্রাপ্তির অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির আনুগত্য আপনি সেই সময়ই করতে পারেন যখন আল্লাহ তাদের আনুগত্য করার অনুমতি দয়ে থাকেন এবং সেই কাজই আনুগত্য করতে পারেন যা জায়েয বা বৈধ। আল্লাহর নাফরমানী করে কারোর আনুগত্য করলে আপনি গুনাহগার হবেন এবং আপনার এ আনুগত্য আল্লাহর নাফরমানী হবে। আল্লাহর আনুগত্যে পিতা-মাতার আনুগত্য থাকা যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম তেমনি আল্লাহর নাফরমানীতে তাদের আনুগত্য করা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

পিতা-মাতার অধিকার প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। এ হাদীস সামাজিক জীবনের এক চরম নাজুক ও গম্ভির মাসায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অনেক সময় হাদীসটির বাহ্যিক নাজুক ও লোকজন ভূল ধারণায় নিপতিত হয়ে থাকে। প্রয়েজন হলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঠিক ইচ্ছা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন পদক্ষেপ না নেয়া যাতে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর নাফরমানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

"হযরত অবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমার একজন স্ত্রী ছিল। তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম এবং হযরত উমার (রাঃ) তাকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং তিনি আমাকে বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। তখন হযরত উমার (রাঃ) রাসূল (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তার নিকট সকল ঘটনা বললেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন আবদুল্লাহ তালাক দিয়ে দাও।" (আবু দাউদ তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

এ হাদীস আপনার নিকট জোরের সাথে এ দাবী করে যে, আপনি পিতমাতার পূর্ণ আনুগত্য করতে থাকুন এবং নাফরমানীর ধারণাও অন্তরে স্থান দেবেন না। কিন্তু এথেকে পিতা-মাতার আনুগত্য শর্ত ও বিঘ্নহীন মনে করাও সঠিক নয়। হাদীসটির বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে মানুষ এ ভুল ধরণায় নিপতিত হয় যে, পিতা-মাতার এ অধিকারও রয়েছে যে, যখন তাঁরা চাইবেন তখনই ছেলেকে তার স্ত্রী তালাকের নির্দেশ দেবেন। তার স্ত্রী যদি নেকও

অনুগত হয় তাহলেও তিনি তালাকের নির্দেশ দেবেন। আর যখন চাইবেন তখন কন্যাকে স্বামী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিবেন। যদি স্বামী নেককারও হয়। সম্পর্ক ছিন্ন করার শরয়ী কোন কারণ না থাকলেও পিতা-মাতার নির্দেশই তা করতে হবে।

এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা। এর সাথে শরীয়তের প্রকৃতি কোন সম্পর্ক নেই এবং শরীয়তের মৌলিক শিক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্কও নেই। কোন হাদীস বোঝার জন্য এবং রাসূলে পাক (সঃ)-এর সঠিক ইচ্ছা জানার জন্য প্রয়োজন হলো কুরআনও সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষা এবং দ্বীনের সামগ্রীক প্রকৃতির আলোকে তা বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী হয় এবং দ্বীনের মৌলিক শিক্ষার সাথে সম্পর্ক থাকে।

এ ঘটনা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রাঃ)-এর। যিনি দ্বীনের রুহুকে প্রকৃতরূপে সংশোধন করেছিলেন। যাঁর চক্ষু শারীরিক দ্বীনকে চলমান অবস্থায় দেখেছেন। যিনি দ্বীনের মেযাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। যিনি এ তাৎপর্যও জানতেন যে স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্ক নফল ইবাদত থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলাম যে কোন মূল্যে এ সম্পর্ক স্থায়ী রাখার তাকিদ দেয়। আর শুধুমাত্র সে অবস্থাতেই এ পবিত্র সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি প্রদান করে যখন বাস্তবিকই তা অব্যাহত থাকায় বৃহতর দীনি ও সামাজিক ফিতনা মাথা তুলে দাঁড়ানোর আশাংকা সৃষ্টি করে। তিনি এ কথাও ভালোভাবে অবহিত ছিলেন যে, এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার শুধু সেই শয়তানই খুশি হয় যে শয়তানের উপর আল্লাহর চিরকালীন অভিসম্পাত রয়েছে। তিনি পুত্রবধুকে ঘৃনা করতেন এবং নিজের পুত্রের সাথে থাকা পছন্দ করতেন না। চিন্তা করুন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মত দ্বীন সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি নিজের পুত্রবধুকে কেন পছন্দ করতেন না। এ কথাও কি চিন্তা করা যায় যে, পুত্রবধুর সাথে তার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল এবং তিনি কোনপার্থিব উদ্দেশ্যে পুত্রবধুকে স্বামীর অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। অথবা পুত্রবধুর কোন নাফরমানীর কারনে তাঁর জিদ হয়েছিল যে, তালাক দেয়া ছাড়া তিনি ক্ষান্ত হবেন না। সাহাবীর তাকওয়া সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কোন মহিলা কি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সম্পর্কে এ কথা ভাবতে পারে? সেই হযরত উমার (রাঃ) যিনি দ্বীনের জন্য নিজের সব কিছু কুরবানী করেছিলেন।

দিনের সূর্যালোকের চেয়ে আরো স্পষ্ট যে, অবশ্যই তার সামনে কোন বৃহত্তর দ্বীনি লক্ষ্য ছিল এবং কোন আখলাকী ও স্বামাজিক মুসলিহাতের কারণেই তিনি পুত্রের নিকট তালাকের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আবার এ জন্যও নয় যে, আমি তোমার পিতা। পিতা হওয়ার মর্যাদায় অকারনেও তোমাকে দিয়ে তালাক দেয়াতে পারি এবং তোমার অপরাধ থাকুক আর না-ই থাকুক বাধ্য হয়ে তোমাকে আমার অনুগত থাকতে হবে।

অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বয়ং একজন নেককার যুবক ছিলেন। দ্বীন সম্পর্কে তিনিও পরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। মন ও অন্তর দিয়ে রাসুল (সঃ)-এর সুন্নাতের পাবন্দী করতেন। রাসূল (সঃ)-এর প্রশিক্ষণেই তাঁর চিন্তা-ভাবনা লালিত হয়েছিল। পিত-মাতার অধিকার এবং আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পর্ণরুপে অবহিত ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে কেউ এ ধরণাও পোষণ করতে পারে না যে, তিনি পিতা-মাতার নাফরমান ও হতে পারেন। তাঁর নিকট যখন হযরত উমার (রাঃ) তালাক দাবী করলেন, তখন তার জবাবে হযরত উমার (রাঃ) এ কথা বলেননি যে, তুমি আনুগত্য অস্বীকার করে পিতার অবাধ্য হয়ে গেছো। বরং মামলাটি রাসূল (সঃ)-এর দরবারে পেশ করলেন। আর এ দরবার থেকে সময় বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় এ ফরমান জারী করা হয়েছিল যে, স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ এবং তাদের সাথে কৃত ওয়াদা জীবন ভর পালন কর। এতে যদি তোমাদের কিছু কষ্টও স্বীকার করতেহয়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) ব্যাপারটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার পর হযরত উমার (রাঃ) কে তালাকের নির্দেশ দিলেন।

আপনি যখন দ্বীনের এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হাদীসটি সম্পর্কে চিন্তা করবেন তখন এ উপসংহারেই পৌছবেন য়ে, হাদীসটির মর্মার্থ তাই। দ্বীনের প্রকৃতিও তাই দাবী করে এবং কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাও এ কথাই বলে। দ্বীনের সুস্পষ্ট হেদায়াত উপেক্ষা করে শুধুমাত্র হাদীসটির প্রকাশ্য শব্দের কারণে মাতা-পিতাকে কি কোন বৈধ মুসলিহাত থাকুক পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে তালাক দেয়ানোর অধিকার দেয়া যেতে পারে? অথবা কন্যাকে নির্দেশ দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে খোলা করানোতে বাধ্য করা যায়?

পিতা-মাতার অনুগত্য যদি এ ধরনের বাধা-বিঘ্ন মুক্ত হয়, তাহলে শাশুড়ী-পুত্রবধুর ভবিষ্যত টানাপোড়নে প্রতিদিন হাজার হাজার ঘর ভাঙবে এবং হাজার হাজার নিরপরাধ মহিলা ও পুরুষের জীবনের আরাম হারাম হয়ে

যাবে। আল্লাহর শরীয়ত এ জন্য নয় যে, তার মাধ্যমে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ এবং শত্রুতা, ক্রোধ ও ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহৃত হবে। মাতা-পিতা যখন চাইবে তখনই তার সাহায্য নিয়ে নিরপরাধ কোন মহিলাকে স্বামীর ভালোবাসা ও অভিবাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করবে এবং কোন বেকসুর যুবককে নেক স্ত্রীর প্রেম ও ভালোবাসা থেকে মাহরুম করতে বাধ্য করবে।

সন্তানের নিকট থেকে এ ধরনের আনুগত্যের দাবী এবং তাও আবার যুক্তি বিরোধী। তা'হলে তা হবে অত্যন্ত হৃদয়হীনতা ও কঠোর ব্যাপার। আর ইনসাফ তো এ কথা বলে যে, দ্বীন সন্তানের নিকট থেকে এ ধরনের আনুগত্য দাবী করতে পারে না। মুল্লা আলী কারী (রাঃ) এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, মাত-পিতা যদি পুত্রকে তার স্ত্রী তালাকের নির্দেশ দেয় তাহলে পুত্রের উপর সেই নির্দেশ পালন ওয়াজিব নয়। মশহুর মুহাদ্দিস ও ফকিহ হযরত আজ্জুদিন শাফেয়ী (রাঃ) বলেছেন, সকল ব্যাপারেই পিতা-মাতার আনুগত্য সন্তানের উপর ওয়াজিব নয়। অথাৎ মাতা-পিতা যা হুকুম করবে অথবা নিষেধ করবে তাই পালন করা পুত্রের জন্য ওয়াজিব নয়।

দ্বীনে পিতা-মাতার আনুগত্য ও শুকুর গুজারীর যে গুরুত্ব রয়েছে তাকে কে অস্বীকর করতে পারে। কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, প্রত্যেক বৈধ ও অবৈধ মুয়ামেলায় তাদের আনুগত্য ওয়াজিব। তালাক এবং খোলার মাসয়ালা অত্যন্ত নাজুক প্রকৃতির ও সুদূরপ্রসারী ফল বহন করে। তার প্রভাব শুধু তালাকদাতা পুরূষ ও খোলাকারী মহিলার উপরই পড়ে না, বরং তার দুঃসহ প্রভাবে বহু নিরপরাধ মানুষও প্রভাবিত হয়। সারা জীবন তাদেরকে ভোগন্তিতে থাকতে হয়।

এ সমগ্র আলোচনা শুধু সেই অবস্থার জন্য প্রযোজ্য যখন মাতা-পিতা কোন শরয়ী মুসলিহাত ও যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া তালাক এবং খোলার জন্য বাধ্য করে থাকেন। আপনি যদি অনুভব করেন যে, পিতা-মাতার নির্দেশ কোন ব্যক্তিগত রেষারেষি জিদ অথবা পাথিব কারণে নয়, বরং কোন দ্বীন অথবা স্বামাজিক কারণে দেয়া হয়েছে তাহলে আপনি কোনক্রমেই সেই নির্দেশ অমান্য করতে পারেন না। তখন মন-প্রাণ দিয়ে তা পালন আপনার জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। আপনার জন্য এটা কখনোই জায়েয নয় যে, আপনি ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তাঁদের আনুগত্যের উপর অগ্রাধিকার দেবেন এবং

নিজের ভালোবাসার ওজর পেশ করবেন। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহ ও আনুগত্যের দাবী হলো যে, আপনি নিজের ভালোবাসা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে কুরবানী করে দেবেন এবং তাঁদের সন্তুষ্টির মধ্যেই নিজের খুশী অনুভব করবেন।

একবার হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধিই পেতে থাকলা। এমনকি জীবিত থাকার আর আশা রইল না। এ সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) দুর-দূরান্তে থেকে সফর করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করে এলে? ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, হযরত! শুধু আপনার সেবার জন্যই আমি এখানে হাজির হয়েছি। কেননা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে গভীর সর্ম্পক ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) একবার সফরে ছিলেন। এ সময় মক্কার এক বুদ্দুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) -কে খুব ভালোভাবে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি হযরত উমারের পুত্র? হযরত ইবনে উমার জবাব দিলেন এবং জ্বী হাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিলেন এবং নিজের গাধার উপর সম্মানের সাথে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বললেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে এসব দেখতে লাগলাম এবং পরে বললাম হে হযরত! সে তো একজন গ্রামবাসী। আপনি যদি দু'দেরহাম দিয়ে দিতেন তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, ভাই আমার পিতা হযরত উমার (রাঃ)-এই বন্ধু ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, পিতার বন্ধুদেরকে সম্মান করো এবং এ সর্ম্পক শেষ হতে দিও না। নচেত আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আলো নির্বাপিত করে দেবেন।

হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বলেছেন, আমি যখন মদিনায় এলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, হে আবু বুরদাহ! তোমার নিকট কেন এসেছি তা কি তুমি জান? আবু বুরদাহ (রাঃ) বললেন, হযরত আমি তো তা জানি না। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচারণ করতে চায় তার উচিত

পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুন্দর আচারণ করা। এরপর তিনি বললেন, ভাই! আমার পিতা হযরত উমার (রাঃ) এবং আপনার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর হক আদায় করতে চাই।

চার ঃ পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচারণঃ পিতা-মাতার ওফাতের পর আচারণের চতুর্থ পন্থা হলো, পিতা-মাতার আত্মীয় স্বজনের সাথে সুন্দর আচারণ করা। মাতার পক্ষের আত্মীয় যেমন খালা, মামু, নানী, নানা, প্রভৃতি এবং পিতার পক্ষের আত্মীয় যেমন চাচা, ফুফু, দাদা-দাদী ইত্যাদি। এ সকল আত্মীয় থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা থাকা এবং বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে পিতা-মাতার প্রতি মুখাপেক্ষীহীনতা থাকার নামান্তর এবং একজন মু'মিন ও মুমিনা পিতা মাতার সাথে বেপরোয়ামূলক আচারণ করতে পারে না। আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর এরশাদ হলো, তোমরা তোমাদের পিতাও পিতামহের সাথে কখনও বেপরোয়ামূলক আচারণ করবে না। মাতা-পিতা ও পিতামহের সাথে কখনও বেপরোয়ামূলক আচানরণ করবে না। পিতা-মাতার সাথে বেপরোয়ামূলক আচারণ করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার সামিল।

"হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি আজীবন পিতা-মাতার নাফরমানী করে এবং তার পিতা-মাতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তিকাল করেন তাহলে তার উচিত অব্যাহতভাবে পিতা-মাতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ নিজের রহমতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে লিখে দেন।"

আজীবন পিতা-মাতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর আচারণ এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার প্রচেষ্টা অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তাহলেও আল্লাহর রহমতের দরজা খোলা থাকে ও ক্ষতিপূরণ সম্ভব। অব্যাহতভাবে তাঁদের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ পাক ভুল ক্ষমা করে দিতে পারেন বলে আশা করা যায় ও আপনাকে উত্তম বান্দারই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বান্দাহর অন্তরে যখনই তওবার আবেগ সৃষ্টি হয় তখনই তিনি অগ্রসর হয়ে তা কবুল করে নেন এবং সেই আবেগকে অগ্রসর করানো ও জীবনের উপর তার প্রভাব ফেলার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন কিন্তু এ হাদীস থেকে ভুল ধারণা নেয়া অবশ্যই ঠিক নয় যে, মাতা-পিতা জীবিত থাকা

অবস্থায় অবাধ্য থেকে তাঁদের মৃত্যুর পর দোয়া এবং ইসতিগফার করে আল্লাহর রহমত লাভ করা যাবে। সঠিক কথা হলো, জীবিতাবস্থায় তাঁদের খিদমত এবং সন্তুষ্ট রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বলিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, যে সুসন্তানই পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে তার প্রতিদানে আল্লাহ তাকে এক হজ্জের সওয়াব দান করেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ একদিনে শতবার রহমত ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে। তিনি বললেন, জ্বী হাঁ কেউ শতবার দেখে তবুও। আল্লাহ (তোমাদের ধারণায়) অনেক বড় এবং সম্পূর্ণ পবিত্র।"

এ কথার মমার্থ হলো আল্লাহর রহমত এবং ব্যাপকতা এত বড় যে, তিনি তা থেকেও বেশি প্রদান করতে পারেন। যদি কোন সন্তান দিনে শতবার পিতা মাতার প্রতি রহমত ও মুহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখে তা হলে আল্লাহ শত হজ্জের সওয়াবও দিতে পারেন। মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা করতে পারে তিনি তা থেকেও বেশি বড় এবং মর্যাদাবান।

মানুষ নিজের সামর্থকে সামনে রেখে চিন্তা করে থাকে। ফলে এত বড় সওয়াব প্রাপ্তি অসম্ভব বলে মনে হয় এবং ভূল ধারণার শিকার হয়। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে এ ভুল ধারণা পোষণ সঠিক নয়। তিনি প্রত্যেক ভুল ধারণা তেকে পবিত্র। সেই দয়াশীল সত্ত্বা এত দান করতে পারেন যে, মানুষের ধারণা সে পর্যন্ত পৌঁছতেই সক্ষম নয়।

"লোকজন আপনাকে জিজ্ঞেস করে থাকে, আমরা কি খরচ বা ব্যয় করবো। জবাবে বলে দিন, যে মালই তোমরা খরচ কর তার প্রথম হকদার হলো "মাতা-পিতা"। (আল-বাকারা)

কুরআন ও হাদীসে যেবাবে পিতা-মাতার খিদমত, আনুগত্য এবং সুন্দর আচরণের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনি পিতা-মাতার উপর খরচ না করে ধন-সম্পদ বাঁচানো সঠিক নয় বলেও তাকিদ দেয়া হয়েছে। বরং সর্বপ্রথম তাদের উপরই খরচ করতে হবে। আর তাঁরা যদি অভাবগ্রস্থ হন তাহলে জবরদস্তি করেই নিতে পারেন। যদি কেউ পিতা-মাতার খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শনের কমতি না করেও অর্থ খরচ করতে না চায়, তাহলে সেটাও ঠিক হবে না। যেভাবে সন্তানের উপর তাদের অধিকার রয়েছে

তেমনি সন্তানের সম্পদের উপরও তাঁদের অধিকার আছে।

"হযরত মায়াজ বিন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো যে আল্লাহ পাক তার হায়াত বৃদ্ধি করবেন।"

দীর্ঘায়ু লাভ একজন মু'মিনের জন্য এ অর্থে সুসংবাদ যে, সে পরকালীন জীবনকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে আরো পবিত্র আকাংখা পূরণে কাজ করার সুযোগ পেলো।

সন্তান লালন-পালনে মাতা-পিতা উভয়েরই অংশ থাকে। উভয়েই নিজের আরাম-আয়েশ কুরবানী করে সন্তান প্রতিপালন করেন। পিতা শরীরের ঘামের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ সন্তানের প্রতিপালন করেন। পিতা শরীরের ঘামের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ সন্তানের জন্য ব্যয় করেন এবং মাতা নিজার রক্ত পান করিয়ে করিয়ে তাকে পালেন। উভয়ের সম্মিলিত ভালোবাসা, চেষ্টা সাধনায় সন্তান লালিত-পালিত হয়। এ জন্যেই কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের সাথেই সুন্দর আচরণের তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং উভয়কেই খিদমত ও আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এটাও অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, সন্তান প্রতিপালনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট স্বীকার করে থাকেন মা। নিচের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দিয়ে মা শিশুকে পলন করেন। যে আপত্য স্নেহে নিজের কলিজার রক্ত পান করান এবং শিশুর জন্য দিনের আরাম ও রাতের ঘুম অব্যাহতভাবে কুরবানী করেন সেই খিদমত ও কুরবানীর উদাহরণ নেই। এজন্য পবিত্র কুরআনে মাতা-পিতা উভয়ের সাথে সুন্দর আচরণের গুরুত্ব আরোপ করে মায়ের কষ্টের মিত্র অত্যন্ত বলিষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেই সাথে এ তাৎপর্যের প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, জীন উৎসর্গকারিনী মা পিতা তুলনায় খিদমত, আনুগত্য এবং সুন্দর আচরণের বেশি হকদার। এ তাৎপর্যই আল্লাহর রাসূল (সঃ) খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

এবং আমরা মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে করে নিজের পেটে নিয়ে বেড়িয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্ট করেই ভূমিষ্ট করেছে এবং পেটে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজ) সময়সীমা হলো আড়াই বছর" ।-আল-আহকাফ ঃ ১৫।

অন্য আরো এক স্থানে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাকিদ

দিয়ে আল কোরআনে করীমে মাতার সেই নজীর বিহীন কুরবানী ও কষ্টের উল্লেখ করে সন্তানকে মায়ের শুকুরগুজারীর উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

"এবং আমরা মানুষকে, যাকে তার মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে পেটে ধারণ করেছিল (অতপর তাকে দুধ পান করিয়েছিল) অতপর তাকে দু'বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। এ তাকিদ করা হয়েছে যে, আমার শুকুর আদায় করো এবং পিতা-মাতার।" শুকুর আদায় কর

পবিত্র কুরআনের এ বর্ণনা ভঙ্গিতে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, মাতা খিদমত, মুহাব্বত, আনুগত্য, সুন্দর আচরণ ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার বেশি অধিকারী। কেননা সে জন্মদান ও প্রতিপালনে অসামান্য কষ্ট স্বীকার করে থাকে। নিসন্দেহে লালন-পালনে পিতারও অংশ রয়েছে। কিন্তু পিতার পরিশ্রম এ কুরবানীর সাথে মাতার ত্যাগ স্বীকারের কোন তুলনাই হয় না।

হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাসনকালে খেজুরের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে একদিন মানুষজন দেখলো যে হযরত উসমাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) খেজুর গাছ কেটে মাথি বের করছেন। এতে সকলেই আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ হযরত! এ দুর্মুল্যের বাজারে আপনি এভাবে খেজুরের গাছটি নষ্ট করছেন। আজকালতো খেজুরের গাছ অত্যন্ত মুল্যবান বস্তু। তিনি বললেন' "ভাইসব! তোমাদেরকে কি বলবো। আমার মা আমাকে খেজুর গাছের মাথি আনার জন্য আদেশ দিয়েছেন। মায়ের কি কখনো আদেশ অমান্য করা যায়?"

হযরত মুহাম্মদ ইবনে শিরীন (রাঃ) একজন মশহুর তাবেয়ী। তাঁকে ফিকাহ ও হাদীসের ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর মাতা হিজাজের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মাতার আদব ও সম্মান এবং ইচ্ছার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। যখন মায়ের জন্য কাপড় কিনতেন তখন নরম ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। ঈদের প্রদর্শন করতেন যে, কখনো মায়ের কাপড় রং করতেন। মায়ের প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যে, কখনো মায়ের সামনে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। মায়ের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন যেন কোন গোপন কথা বলছেন।

হযরত ওয়ায়েস কুরনী (রঃ) অত্যন্ত মশহুর বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে উত্তম তাবেয়ী উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি

হযরত উমর (রাঃ) কে বলেছিলেন, " উত্তম তাবেয়ীন কুরন গোত্রের একজন মানুষ। তার নাম ওয়ায়েস্তার একজন বৃদ্ধ মা আছেন। যখন সে কসম খায় তখন তা পূরণ করে। যদি তাঁর কাছ থেকে মাগফিরাতের দোয়া নিতে পার তাহলে অবশ্যই নেবে।"

হযরত ওয়ায়েস (রঃ) রাসূল (সঃ)-এর যুগেরই মানুষ ছিলেন। কিন্তু তার সাথে তিনি মুলকাত করতে পারেননি। রাসূল (সঃ)-এর দিদার বা দর্শন লাভ থেকে নিজের চক্ষুকে আলোকিত করার চেয়ে একজন মু'মিনের বড় বাসনা আর কি হতে পারে! কিন্তু বৃদ্ধ মাতা থাকা এবং তাঁকে একাকী রেখে না যাওয়ার ইচ্ছার কারণে হযরত ওয়ায়েস (রঃ) রাসূল (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হতে পারেননি। তিনি দিন রাত তাঁর খিদমতেই লেগে থাকতেন। হজ্জ আদায়ের বড় সাধ ছিল। কিন্তু যতদিন তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁকে একাকী রেখে হজ্জ আদায় করতে যেতে পারেননি। তাঁর ওফাতের পর তিনি এ সাধ পূরণ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, "হযরত! আমি একস্থানে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পয়গাম প্রেরণ করলে সে তা গ্রহণ কনে। এটা মর্যাদা হানিকর ব্যাপার মনে করে এবং আবেগ তাড়িত হয়ে আমি সেই মহিলাকে হত্যা করি। হযরত! বলুন, এখনো কি আমার জন্য তাওবাহর কোন পথ আছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তোমার মা কি জীবিত আছেন।" সে বললো, "হযরত! মা তো ইন্তেকাল করেছেন।" তিনি বললেন, "যাও, অনুতপ্তের সাথে তাওবাহ কর এবং এমন কাজ কর যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পার।"

হযরত যায়েদ বিন আসলাম হযরত ইবনে আব্বাস নিকট এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সেই ব্যক্তির নিকট তার মা জীবিত আছেন কি না-এ কথা কেন জিজ্ঞেস করেছেন? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাতার সাথে সুন্দর আচরণের চেয়ে বড় আমল আমার জানা নেই।

এ ধরনের একটি ঘটনা রাসূল (সঃ)-এর যুগেও ঘটেছিল। এক ব্যক্তি প্রিয় নবী (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর

রাসূল! আমি একটি বড় গুনাহ করে বসেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তওবার কি কোন পথ খোলা আছে? রহমাতে রাসূল (সঃ) বললেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন?" সে ব্যক্তি বললো, হুযুর! মাতা তো জীবিত নেই। অতপর তিনি বললেন, আচ্ছা তোমার খালা কি বেঁচে আছেন? সে বললো, জ্বী, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন, খালার সাথেসুন্দর আচরণ কর।

এ ঘটনা থেকে মাতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিদমতের দ্বীনি গুরুত্বের আন্দাজ করা যায়। মানুষ যদি বড় গুনাহ ও করে তাহলে তার শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ হিসেবে মাতার সাথে সুন্দর আচরণের কথা রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন। আর এটা আল্লাহর চূড়ান্ত রহমত যে, মা যদি ইন্তিকালকরে থাকেন তাহলে মাযের বোনের সাথে আচরণ করে মানুষ নিজের পরকাল তৈরী করতে পারে।

"হযরত আবিদ তোফায়েল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আমি জিয়রানা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে গোশত ভা দেখলাম। ইত্যবসরে একজন মহিলা এলেন এবং রাসূল (সঃ)-এর নি চলে গেলেন। তিনি তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং মহিলাটি তার উপর বসলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম মহিলাটি কে ? তাঁরা বললেন, তিনি নবী (সঃ) -এর মাতা। তিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। (আবু দাউদ)

শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো মাতা-পিতার নাফরমানী। আর এটা এতবড় জঘণ্য অপরাধ যে তা চিন্তা করতেই গা শিউরে উঠে। কৃতজ্ঞতা এবং ইহসান প্রকাশ এমন এক মৌলিক গুণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে সে মানবতা শূণ্য। এ ধরনের মানুষ আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ হতে পারে না। তারা না পারে আল্লাহর হক আদায় করতে। আর না পারে মানুষের অধিকার আদায় করতে। আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় ইহসান হলো মাতা-পিতার। তাদের মাধ্যমেই আল্লাহ জীবন দান করেন। তাদের স্নেহ ও ভালোবাসার ছায়াতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন। তারা নিজেদের অস্তিত্বকে ভুলে সন্তান প্রতিপালন করেন এবং সন্তানের আরাম-আয়েশের চিন্তায় নিজের আরাম-আয়েষ কুরবানী করেন। নিসন্দেহে শারাফত, ইহসান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট দাবী হলো, অন্তরের অন্তস্থল থেকে

তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাদের ইহসানের স্বীকার করা। সারা জীবন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং নিজেকে ভুলে তাঁদের প্রতি সুন্দর আচরণে লেগে থাকা।

যদি কেউ আল্লাহর প্রতি শুকুর গুজার হয, আল্লাহর ইহসানের অনুভূতি রাখে এবং আল্লাহর অনুগত্যহতে চায় তাহলে সে যেন কখনো পিতা-মাতার নাফরমান হতে পারে না। নাফরমান হওয়াতো অনেক দূরের কথা সে পিতা-মাতার প্রতি বেপরওয়াও থাকতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) অত্যন্ত মর্যাদার সাহাবী ছিলেন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম, আবেদ এবং জাহেদ ছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুন্নাতের অত্যন্ত বন্দ ছিলেন। ৬০ বছর ধরে তিনি ফতওয়া ছিলেন। তিনি বলেছেন, মাতা-পিতাকে কাঁদানোর অর্থ হলো তাদের ঐ নী করা এবং এ কাজ কঠিন গুণহর কাজ।

ত আবদুল্লাহ ইবনে আমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাতা-পিতাকে গালি দেয়া কঠিন গুণাহের কাজ। লোকজন চায হয়ে) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ কি নিজের মাতা-পিতাকে গালিও দেয়। তিনি (সাঃ) বললেন, জ্বী হাঁ! মানুষ যদি অন্যের মাতা-পিতাকে গালি দেয়। তাহলে (ফিরে) তার পিতা-মাতার গালি দিয়ে দেয়। সে যদি অন্যের মাকে খারাপ নামে স্মরণ করে। তাহলে সে তার ম্যাকে গাল-মন্দ করে।

এই হাদীস থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পিতা-মাতার মান-সন্মানের প্রতি অবশ্যই নজর করতে হবে। তারা যাতে কোন ধরনের কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয়, অন্যের পিতা-মাতার প্রতি ও এমন উক্তিকরা যাবে না যাতে সে উত্তেজিত হয়ে আপনার মাতা-পিতাকে গাল মন্দ করবে সে।

"হযরত আবু তোফায়েল বলেন, হযরত আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি আপনাকে এমন কোন কথা বলেছিলেন, যা অন্য কাউকে বলেননি? তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তো আমাকে এমন কোন কথা বলেননি যা অন্যকে বলেননি। হ্যাঁ আমার তরবারীর খাপে একটি লিখিত বানী আছে। অতপর তিনি তরবারীর খাপ থেকে সে বানী বের করলেন। তাতে লেখা ছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহ করে

তার উপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ। যে জমির সীমা বদলে দেয় তার উপর আল্লাহর লানত। যে নিজের পিতা-মাতার উপর অভিশাপ দেয় তার উপরে আল্লহর লানত এবং যে দ্বীনের ব্যাপারে কোন নতুন কথা সৃষ্টি করে তার উপরে আল্লহর লানত।"

পিতা-মাতাকে অভিশম্পাত করা এবং গালমন্দ দেয়া এমন জঘন্যতম খারাপ কাজ যা চিন্তা করা যায় না কিন্তু দুনিয়ার এ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে। ক্রোধ, প্রতশোধস্পৃহা, অজ্ঞতা এবং নাদানীর কারণে অনেক সময় মানুষ এমন সব কাজ করে বসে যা সাধারণ অসস্থায় ধারণা করাও দুরুহ ব্যাপার।

মাতা-পিতাও তো মানুষ। তারাও মানবীয় দুর্বলতা থেকে পবিত্র নয় তাদের মধ্যেও ঘৃণা, ভালোবাসা, ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহাসহ অন্যান্য দুর্বলতা বিদ্যমান। মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোন সময় তারা ও এমন কথা বসতে পারেন অথবা এমন আচরণ করে ফেলতে পারেন যা তাদের থেকে অনাকাংখিত। এতে উত্তেজিত হওয়া যাবে না। তাদের সম্পর্কে চোখ বুজে থাকা যাবে না। মাতা-পিতা এমন দু'ব্যক্তিত্ব সন্তানের লালন-পালন ও আরাম আয়েসের জন্য নিজের সমগ্র জীবন বিলিয়ে দেন। তারা যে ধরনের আচরণই করুন না কেন, তাদের সম্পর্কে কিছু বলা শোভনীয় নয়। তাদের গালমন্দ করা এবং সকল ইহসান ভুলে যাওয়াও উচিত নয়।

নিসন্দেহে মাতা-পিতাও কোন সময় সন্তানের হক আদায়ে কমতি এবং নিজেদের অবাঞ্ছিত আচরণের মাধ্যমে সন্তাদেরকে নাফরমানী ও বিদ্রোহেরপথে ঠেলে দিতে পারেন। বিশেষ করে, যখন পিতা দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং সন্তানদেরকে সৎ মা বা বিমাতার সাথে জীবন কাটাতে হয় তখন এ সকল ঘটনা ঘটে থাকে। বিভিন্ন ধরনের দুঃখজনক ঘটনার উদ্ভব হয়। সৎ মা সাধারণত বিভিন্নভাবে পিতাকে সন্তানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন এবং তার আন্তরিক কামনাই হয়ে দাঁড়ায় যে পিতা যেন সন্তানদের সম্পর্কে বিগড়ে যান। সাধারণত পিতাও নতুন স্ত্রীর কিছুটা মনোতুষ্টির জন্য বারবার তার বলার জন্য নিজের সন্তানদের সাথে সৎ পিতার পাল্লায় পড়ে তাহলে সাধারণত সৎ পিতা আগের সন্তানদের সাথে ভালো আচরণ কোন ক্রমেই বরদাশত করতে পারে না এতদূর না হলেও অন্তত সে চায় যে,

পূর্বের সন্তনদের চেয়ে সে যেন নিজের সন্তনদেরকে বেশি ভালোবাসে। মাও কিছুটা স্বামীকে খুশীর জন্য এবং অনেকটা তার ইচ্ছার বলি হয়ে অনেক সময় খারাপ ব্যাবহার করে থাকে। অথচ মার মত ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে এটা অবশ্যই আশা করা যায় না। ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে এ অবস্থায় সামান্যতম হলেও মাতা পিতা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে খান্দান এবং সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। তাদের কর্তব্য হলো এ ধরণের পিতা-মাতার প্রতি লাগাম টানা। তাদেরকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সামাজিক চাপের মাধ্যমে সন্তানদের সাথে সন্তানের মত আচরণে বাধ্য করা। কিন্তু সম্পর্কের কারনে সন্তানদেরকে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পিতা-মাতার ইজ্জত-আবরুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে ...র এবং এমন কথা মুখ দিয়ে বের করা যাবে না যা মায়ের ইজ্জতের ...ন্নী হয়। সর্বাবস্থায় সন্তানের কর্তব্য হলো, যথাসম্ভব কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য ...া আচরণের প্রমাণ দেয়া।

...ার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ ..., হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা খারাপ মেযাজের মানুষ। প্রিয় নবী ...ঃ) বললেনঃ ৯ মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যখন সে তোমাকে পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, তখন তো সে খারাপ মেযাজের ছিল না।"

সেই ব্যক্তি বললো, "হযরত! আমি সত্য বলছি সে খারাপ মেযাজের।" হুযুর (সঃ) বললেন ঃ "তোমার খাতিরে সে যখন রাতের পর রাত জাগতো এবং দুধ পান করাতো, সে সময়তো সে খারাপ মেযাজের ছিল না।"

সেই ব্যক্তি বললো ঃ "আমি আমার মাতার সেই সব কাজের প্রতিদান দিয়ে ফেলছি।"

হুযুর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়ে ফেলেছ?"

সে বললো ঃ "আমি আমার মাকে কাঁধে চড়িয়ে তাঁকে হজ্জ করিয়েছি" প্রিয় নবী (সঃ) সিধান্তমূলক জবাব দিয়ে বললেন ঃ "তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের বদলা বা প্রতিদান দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হবার সময় যে কষ্ট স্বীকার করেছে?"

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমার সুন্দর

আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, অতপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, অতপর কে? নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করলেন, তোমার মা। সে বললো, অতপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।" (বুখারী-ও মুসলিম)

এ হাদীস সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিচ্ছে যে সুন্দর আচারণ, খিদমত এবং আনুগত্য প্রাপ্তির দিক থেকে মাতার মর্যাদা পিতার থেকে বেশি। সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন। আর নবী করীম (সঃ) এ একই জবাব দিতে থাকলেন যে, তোমাদের মাতাই তোমাদের সুন্দর আচরণ প্রাপ্তির বেশি যোগ্য। চতুর্থ বারে তিনি বললেন, তোমাদের নেক আচরণের যোগ্য তোমাদের পিতা। হযরত ইবনে বাত্তাল অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন, খিদমত ও আচারণে মাতার হক পিতার থেকে তিন গুন বেশি। কেননা শিশুর ক্ষেত্রে মাতা এমন তিনটি কাজ আঞ্জাম দেন যা কোন পিতার পক্ষে চিন্তা করাও দুষ্কর। গর্ভাবস্থায় মাতা শিশুকে পেটে ধারণ করে নিয়ে বেড়ায় অতঃপর জন্মদানের কষ্ট স্বীকার করেন এবং নিজের দুধ পান করান। পবিত্র কুরআনে তাঁরা এ তিন গুরুত্বপূর্ণ খিদমত ও কষ্টের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করানো হয়েছে। অতপর প্রশিক্ষণ ও লালন পালনে মাতা-পিতা উভয়েই সমান সমান। এ জন্য উভয়ের সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ এবং হেদায়াত দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'জনের সাথেই আদব, তাজিম, খিদমত, আনুগত্য ও বিনয়মূলক আচরণ করতে হবে। জমহুর উলামা বা অধিকাংশ আলেম এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষন করেন যে, মাতার হক পিতার চেয়ে বেশি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সবসময় মাতার খিদমত এবং আনুগত্য এবং পিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও করতে হবে না। আদব শিষ্ঠচার প্রশ্নে পিতাই বেশি হকদার এবং পিতার থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়া কোনক্রেমেই সঠিক নয়। উভয়ের সাথেই সুন্দর আচরণের তাকিদ দেয়া হয়েছে। অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মাতার দুর্বল প্রকৃতিই বেশি ইহসানের দাবীদার। আর এ ইহসানের দাবীই হলো মাতাকে বেশি বেশি আরামের ব্যবস্থা করা। মাতার আনুগত্যে কখনো কম করা যাবে না। তার মমতার অন্তরে কখনো দুঃখ দেয়া যাবে না। মাতা যেমন সন্তানের শৈশবকালে সব ধরণের আবেগের প্রতি খেয়াল রাখেন তেমনি কোন সময়ই তাঁর আবেগের অমর্যাদা করা যাবে না। তার সব সময় আমাদের খেদমত করা প্রয়োজন।

রাসূল (সঃ)-এর যুগে একজন সাহাবী কোন কথার কারণে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন এবং শিশু সন্তানকেও তার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চাইলেন। মায়ের অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো নাজুক। এক দিকে স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতার দুঃখ, অন্যদিকে কলিজার টুকরো এবং দুশ্চিন্তা হরণকারী সন্তানও চিনিয়ে নেয়ার মত অবস্থা। দুঃখ ভারাক্রান্ত ও পেরেশান মনে সে রহমতে আলম (সঃ) এর খিদমতে হাজির হলো এবং নিজের সমগ্র দুঃখপূর্ণ কাহিনী অত্যন্ত কান্না ভাষায় ব্যক্ত করলো। সে বললো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছেন। এভাবে আমি তার অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছি। হে আল্লাহর রাসূল! এখন তিনি আমার নিকট থেকে এ শিশু সন্তান ও ছিনিয়ে নিতে চান। হে আল্লাহর রাসূল! হে রহমতে আলম! এটা আমার আদরের সন্তান। আমার গর্ভ তার আরামস্থল। আমার বুকের ছাতি তার পানির মশক এবং আমার কোল তার [illegible]দৃশ। সে আমার আরামের আধার। সে আমার জন্য কূপ থেকে পানি [illegible]া। হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ দুঃখ কি করে বরদাশত করবো।"

প্রিয় নবী (সঃ) বললেন, লটারী করে নাও। পিতা অগ্রসর হয়ে বললো, হে আল্লহর রাসূল! এটাতো আমার বাচ্চা। আমার সন্তানের দাবীদার আর কে হতে পারে। নবী করীম (সঃ) শিশু ছেলেটিকে সম্বোধন করে বললেন, ইনি তোমার পিতা এবং ইনি তোমার ইনি তোমার মাতা। বেটা। যাকে ইচ্ছা তার হাত ধর। ছেলেটামায়ের হাত ধরলো।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছেলেটির মাকে বললেন, যাও। যত দিন তোমার দ্বিতীয় বিয়ে না হবে ততদিন কেউ তাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোমার ছেলে তুমি নিয়ে চলে যাও–

এ হাদীসের মর্মার্থ হলো, অন্য গুণাহর শাস্তি প্রদানে আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্ব করেন এবং দুনিয়ায় সে ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে মাহফুজ থাকে। কিন্তু পিতা-মাতার নাফরমানী এমন এক পাপ যে তার শাস্তি দুনিয়াতেই ভূগতে হয় আর আখিরাতের শাস্তিতো রয়েছেই।

হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন তিনটি গুনাহ এমন যে, তার সাথে কোন নেকী কাজে দেয় না। প্রথম শিরক দ্বিতীয় পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং তৃতীয়ত ঃ জিহাদ থেকে পলায়ন।

অন্য এক সাহাবী আমর বিন মাররাহ (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবী (সাঃ)-এর

নিকট এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, নিজের মালের যাকাত দেই, রমযানের রোযা রাখি। এ কথা শুনে নবী করীম (সঃ) বললেন, যে এ কথা বলে শেষ করলো সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদদের সাথে থাকবে (এবং তিনি হাতের দু'আঙ্গুল উঠালেন), শর্ত হলো সে যেন পিতা-মাতার অবাধ্য বা নাফরমান হয় না।

আল্লাহর নেয়ামত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল মাতা-পিতা, মানুষের জন্ম গ্রহণ ও লালন-পালনে আল্লাহর পরেই পিতা-মাতার বড় অবদান। আপনি তাঁদের ইহসানের স্বীকৃতি জানালেন। আর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেন।

মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখুন-তা হলে আল্লাহআপনার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনার কোন নাফরমানীর কারণে তাঁরা নাখোশ হলে আল্লাহ আপনার উপর নাখোশ হবেন। পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

মাতা-পিতার সাথে ভাল আচরণ ও তাঁদের খিদমত জিহাদ করার সমতুল্য বরং কোন কোন সময় তার থেকেও বড় কাজ। আপনি তাদের খিদমতে রত থাকলে মুজাহীদিনের ন্যায় আপনিও দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারীদের দলে গণ্য হবেন। আল্লাহর দৃষ্টিতের ময়দানে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী আপনিও পাবেন।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি বেহেশতের চাবিকাঠি। মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে।

যাকে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন তাকে আসলে বেহেশতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে এ সুযোগ কাজে লাগবে তাকে আল্লাহ বেহেশত দেবেন। আর যে এ সুযোগ গ্রহন না করবে সে ধ্বংস হবে।

আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা, হজ্জ ও ওমরা করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কেউ যদি পিতা-মাতার খেদমত করতে থাকে আল্লাহ তাকে হজ্জ ও ওমরাকরীর সমতুল্য সাওয়াব দান করবেন।

আপনি আপনার পিতা-মাতারআদবও সম্মান করলে আপনার সন্তানও

আপনাকে সম্মান করবে। আপনি আপনার পিতা-মাতার ভাল করলে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সন্তানদেরকেও সে শিক্ষাই দেবেন।

পিতা-মাতার খিদমতের সমস্ত মসিবত ও দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে যায়।

পিতা-মাতার আনুগত্য, আদব ও সম্মান প্রদর্শন হতে কখনো দূরে থাকবেন না। এতে হায়াতে বরকত এবং রুজি-রোজগারের পথ প্রসস্ত হবে।

সন্তানের আশা কার না হয়। এমন ঘর নেই যেখানে সন্তনের চাহিদা নেই। বাস্তব ব্যাপার হলো, সন্তানের উপস্থিতিতে ঘরের শোভা বর্ধন করে। সে ঘরতো শোভা সৌন্দর্যহীন যে ঘরে নিস্পাপ শিশুদের কলকাকলি নেই। বিশেষ করে যে গৃহে শিশুর কল-গুঞ্জন থাকে না সে ঘরকে মহিলারা ভীতিপদ বলে মনে করে। মহিলারা তো শিশুর আশায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়ে থাকে। কল্পনা রাজ্যে তারা কখন কোল আলোকিত করে শিশুর আসবে সেজন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কখন সে শিশু আম্মু আম্মু ডাকবে তার জন্য সে ব্যস্ত হয়। এ খুশির জন্য সে দিন গুণতে থাকে নিজের আত্মিকআনন্দের বদৌলতে অভ্যন্তরীণ সুস্থতা অনুভব করে। কখনো কখনো সে কল্পনা জগতে প্রাণপ্রিয় সন্তানের সুন্দর বা অসাধারণ সাফল্যমন্ডিত ভবিষ্যত এবং হাসি-খুশীপূর্ণ বসন্তের কথা চিন্তা করে নিজের মধ্যে মর্যুদুপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব আবিস্কার করে। অতপর কৃতজ্ঞতার আবেগে আল্লাহর নিকট মস্তক অফুরন্ত করে দেয়। সে ভাবতে থাকে যে, তার অস্তিতত্বের উপর আল্লাহ কতবড় ইহসান করেছেন এবং তার অস্তিত্বকে মানব সমাজের জন্য কত মূল্য ও প্রয়োজনীয় হিসেবে চিন্তা করা হয়েছে। আল্লাহ মহিলাদের প্রকৃতিই কিছুটা এমন করেছেন যে, তারা জীবনটাই সন্তানের জন্য মনে করে এবং সন্তানের জন্য জীবনটা কুরবানী করে অগাধ শান্তি ও খুশি অনুভব করে। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে নিজের কলিজার টুকরোকে শরীর ও মনের শরীক রেখে একদিন একদিন করে সময় গুণতে থাকে এবং যখন আল্লাহপাক নিজের ফজিলতের মাধ্যমে একটি শিশু উপহার দিয়ে তার কোল ভরে দেন তখন স্নেহের দৃষ্টিতে সে নবজাতকের প্রতি দৃষ্টিতে সে নবজাতকের প্রতি দৃষ্টি ফেলে। এ সময় সে চিন্তার জগতে থেকে সে সব দুঃখ-কষ্টের চিত্র ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয় যা শিশুর জন্মদান পর্যন্ত স্বীকার করে থাকে। অতপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়। এ পর্যায় হলো শিশুর

লালন-পালনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের পর্যায়। প্রকৃত ঘটনা হলো, আল্লাহ পাক তার প্রতি মহান সেবার দায়িত্ব পূণ করেছেন। এ জন্য আল্লাহ পাক উদারতার সাথে ত্যাগের অসাধারণ আবেগ, দুঃখ-কষ্ট স্বীকারের নজীরবিহীন হিম্মত ও ধৈর্য এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য মহিলাদের মধ্যে সুউচ্চ নৈতিক যোগ্যতাবলীও দান করেছেন।

মহিলারা শুধু দায়ে ঠেকেই এ সকল দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে না বরং প্রাকৃতিক দাবী অনুযায়ী দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে আনন্দ এবং গৌরব অনুভব করে থাকে। সন্তান জন্মদানের জন্য বার বার মৃত্যুর জন্য অগ্রগামী হবার নজীরবিহীন সাহস সে রাখে। সন্তানের লালন-পালন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য সে নিজের সাধ-আহলাদ ও রূপ-যৌবন কুরবানী করায় প্রগাঢ় শান্তি এবং আনন্দ অনুভব করে থাকে।

মহিলাদের চিন্তাধারা যদি ইসলামী হয়, তাহলে দুঃখ-কষ্ট সহ্যের প্রতিটি স্তরে সে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত বলে চিন্তা করে থাকে। সর্বোপরি মনে করে যে, সে ইবাদতে মশগুল আছে। ইসলাম প্রতিটি মহিলার অন্তরে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, মহিলাদের এ শারীরিক ও প্রকৃতিগত কাজ, প্রতিদান এং তার উপকারিতা শুধুমাত্র এ নশ্বর জগতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং তার দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ ও কুরবানীর প্রতিটি কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে ইবাদত ও জিহাদের সমতুল্য। প্রত্যেক মহিলা যারা এসব মুসিবত সহ্য করে এবং সন্তানদের জন্য কুরবানী প্রদান করে প্রকৃতপক্ষে তারা জিহাদে তৎপর এবং আল্লাহর ইবাদাতে মাসগুলো থাকে। এ জিহাদ ও ইবাদাতের পার্থিব ফায়দা ও আছে। কিন্তু মুসলমান মহিলাদের দৃষ্টি চিরকালীন নেয়ামত সমূহের প্রতিও নিবদ্ধ থাকে। আর এ সকল নেয়ামত পরকালীন জীবনে লাভ হবে। মুসলমান মহিলার স্বতন্ত্র্য হলো, সন্তানদের জন্য বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, নিজের সাধ-আহলাদ, আবেগ এবং রূপ-যৌবন কুরবানী করে, বদলায় সে শুধু পার্থিব উপকারই লাভ করে না (এ পার্থিব লাভ কখনো হয়, আবার কখনো হয় না) বরং পরকালের চিরকালীন আল্লাহর সন্তুষ্টির বা বেহেশত জীবনে লাভ করবে। জান্নাতীও সে জান্নাত যেখানে তার প্রতিটি ইচ্ছে পূরণ করা হবে। পত্যেকটি আবেগ পূরণের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে এবং তাকে এমন রূপ ও যৌবন দান করা হবে যা কখনো নষ্ট হবে না। আর এ রূপ-যৌবন বার্ধক্যের আশংকামুক্ত থাকবে।

ইসলামী ধ্যান-ধারণার একটি উত্তম দিক হলো, মুসলমনি মহিলা যদিও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালনের পর দুর্ভাগ্যবশত পার্থিব কল্যাণ থেকে বঞ্চিতও হয় তাহলেও সে নিরাশ হয় না এবং দায়িত্ব পালনেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সে অত্যন্ত শান্তি ও আন্তরিক আবেগের সাথে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখে। সন্তানদের জন্য সকল ধরণের দুঃখ সহ্য এবং ত্যাগ স্বীকারের পরও যদি সে সন্তানদের নিকট থেকে কোন সুখ না পায় ও সন্তানরা যদি তার আশা-আকাংখা ও স্বপ্নকে ভেঙ্গে খান খানও করে দেয়, তবুও সে নিরাশার শিকারে পরিণত হয়ে নিজের কাজে লজ্জিত হয় না। এ প্রশ্নে ভবিষ্যতের জন্যেও সে ভুল চিন্তা করে না। কেননা সে অবগত যে, মু'মিন মহিলার আসল এবং প্রকৃত সাফল্য হলো পরকালীন সাফল্য। এ কথা ভেবে সে সবসময় সান্ত্বনা পায় যে, আল্লাহ আখিরাতে তার কাজের বদলা দেবেন। আর বদলা এত পরিমাণ হবে যে, তাতে আফসোসের কোন প্রশ্নই নেই। খানকার প্রতিদান ছিনিয়ে নেয়ারও কোন আশংকা থাকবে না। এ জন্য রাটা জীবন সে সকল কাজকে ইবাদাত ও আল্লাহর পথে জিহাদ মনে করে জীবন যাপন করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

অর্থ ঃ "মহিলা যখন আশায় থাকে, তখন গর্ভ ধারণের পুরো সময়টাই সে প্রতিদান ও সওয়াব পায় যেমন সওয়াব ও প্রতিদান একজন রোযাদার রাত জাগরণকারী, আনুগত্যকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী বান্দাহ পেয়ে থাকে। এবং শিশু ভুমিষ্ঠ হবার সময়কার কষ্টের বিনিময়ে যে প্রতিদান ও সওয়াব তার আন্দাজ সৃষ্টজীব করতে পারে না। সে সওয়াব যে কি এবং কত তা ধারণাই করা যায় না। মহিলার চীৎকারের পর যখন শিশু জন্ম নেয় (এবং সে তাকে নিজের দুধ পান করিয়ে পালন করে তখন দুধের প্রতিটি ফোকে সে ছওয়াব প্রতিদান স্বরূপ পায় যা একজনকে জীবনদানের জন্য পাওয়া যায়। এবং যখন (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুধ পান করিয়ে) দুধ ছাড়ানো হয় তখন আল্লাহর ফেরেশতা (সম্মান ও ভালোবাসায়) তার কাঁধে হাত রেখে তাকে বলতে থাকে (আল্লাহর দাসী!) এখন দ্বিতীয়বার গর্ভে ধারণের জন্য প্রস্তুতি নাও"।

যে মহিলা বার বার নিজের জীবনকে বিপদসংকুল করে, শরীর ও জীবনীশক্তিকে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে সন্তান জন্ম দেয় ও লালন-পালন করে সে স্বাভাবিকভাবেই সে সন্তানদের নিকট কিছু আশা করে। আন্তরিক আকাংখা

থাকে যে, তার সন্তানদের ভবিষ্যত ভাল হোক, ভাগ্যবান হোক, খিদমত গুজার হোক, মা'র চিন্তাধারা ও আদর্শ অনুযায়ী উত্তম ভবিষ্যত গঠনকারী হোক, পিতা-মাতার দ্বীন ও সভ্যতার সংরক্ষক হোক, নজীরবিহীন অনুগত হোক। যখন সে অবলোকন করে যে, সন্তানরা তার স্বপ্ন-সাধকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে ও ইচ্ছানুযায়ী লালিত-পালিত হচ্ছে এবং আল্লাহ তাদেরকে উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে উত্থিত করেছে তখন তার আনন্দ ও গৌরবের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

কিন্তু এ সন্তান যাদের খিদমতে দুর্বল মা রাত-দিন ব্যস্ত থেকে শরীর ও জীবনের শক্তি ব্যয় এবং হাত প্রসারিত করে সব সময় দোয়া করে থাকে, তারাই যদি মায়ের স্বপ্ন-সাধ ও আশা-আকাংখাকে ধুলিসাৎ করে দেয় এবং নাফরমান ও বিদ্রোহী হয় তাহলে সে মা'র কি অবস্থা দাঁড়ায়। তার মানসিক ও অন্তরের জ্বালা এবং যাতনা কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

বর্তমান যুগে কতিপয় ভাগ্যবান পরিবার ছাড়া প্রতিটি পরিবারে এ ক্রন্দন এবং হা-হুতাশ। সকলেরই একই বক্তব্য সন্তানদের অবস্থা অবর্ণনীয়। পুত্র হোক অথবা কন্যা হোক পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে তারা গাফেল। পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শন এবং আনুগত্য প্রকাশ একদমই তাদের মাঝে নেই। মনে হয় পিতা-মাতার সাথে আচরণ, সন্তুষ্টি, খিদমত, সম্মান প্রদর্শন, আবেগ-অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি যেন অর্থহীন কথা। একটি সাধারণ অভিযোগ হলো, সন্তানরা অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। যে মজলিশেই বসুন, যে ঘরেই যান একই কথা শুনতে পাবেন এবং মাতা-পিতাকে একই ব্যাপারে ক্রন্দনরত দেখতে পাবেন। অতপর কিছু বয়স্ক বৃদ্ধা নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে থাকুনে, আরে বেটি! আমাদের সময়ে কি সন্তানরা পিতা-মাতার সামনে উঁচুস্বরে কথা বলতে পারতো! এরপর খারাপ পারিপার্শ্বিকতা, রঙিন কাল, ভুল ও খারাপ চিন্তা-ধারার প্রসার, অশ্লীল কথা বার্তা সাহিত্য, নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ইত্যাদির লম্বা কাহিনী শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক মহিলা এক ধরণের শান্তি অনুভব করে চিন্তা করতে থাকে যে, এ অবস্থায় এ ছাড়া আর কি হতে পারে। পিতা-মাতার আর কি করণীয় থাকতে পারে। এ পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক।

নিঃসন্দেহে পিতা-মাতার সামর্থে সব কিছু থাকে না। কিন্তু নিজেদের

ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সামর্থ তো তাদের আছে। আল্লাহর দ্বীনের আলোকে নিজেদের কাজ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, সন্তানদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও লালন-পালনের ব্যাপারে আল্লাহ মা'র উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা পালনে কোন ত্রুটি হচ্ছে নাতো? সন্তনদের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে আপনাদের আশা আকাংখায় কোন জটিলতা নেই তো? সন্তানরা তখনই আপনার আশা আকাংখা পূরণ করতে পারে যখন আপনিও তাদের অধিকার সম্পর্কে গাফেল না হন। সন্তনকে আপনি যে নৈতিক চরিত্রে বিভূষিত দেখতে চান, যে ধরণের সৌভাগ্যবান, খিদমত গুজার, অনুগত এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী আশা করেন তা পূরণ হতে পারে। আপনি যদি সেসব দায়িত্ব অনুভবকরেন এবং তনু-মন-ধন দিয়ে তা পূরণ করেন। সন্তানের অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহ নিসন্দেহে দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু এটাও চিন্তার বিষয় যে, তাদের এ অবস্থা মাতা-পিতার গাফলতি ও দায়িত্ব চেতনতার অভাবের ফলশ্রুতি কিনা। সে সন্তান আপনার অধিকার সম্পর্কে কি করে চিন্তা করবে যাকে আপনি অধিকারের অনুভূতিই দেননি। সে সন্তান পিতা-মাতার খিদমত এ ভালোবাসার কথা কিভাবে চিন্তা করতে পারে যাকে কোন সময় বলাই হয়নি যে, পিতা-মাতার খিদমত ও সম্মান করা সন্তানের উপর ফরয। আপনি যদি তাদের আবেগ ও অনুভূতির কথা খেয়াল না করেন তাহলে তারা আপনার আবেগ ও অনুভূতির খেয়াল রাখা কার কাছ থেকে শিখবে। আপনি যদি তাদের ভালো না বাসেন এবং নিজের আচরণ দিয়ে তাদেরকে এটা বুঝিয়ে থাকেন; তাহলে তারা আপনাকে ভালোবাসা ও আপনার খিদমত করার কথা কিভাবে চিন্তা করবে। আপনি যদি নিজের আরাম-আয়েশের সব কিছু বুঝে থাকেন এবং তাদের প্রযোজনের কথা ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রয়োজনের অনুভূতি তাদের কোথায় থেকে আসবে। আপনি যদি সমাজ সংস্কার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনে কোন বিশেষ আদর্শের ধারক-বাহক হন, তাহলে সে আদর্শের মর্যাদা তাদের অন্তরে প্রতিষ্টা না করেন তাদেরকে সে আদর্শের ধারক-বাহক কিভাবে হতে বলেন। সন্তনদের নিকট থেকে সে আশাই করুনা যার জন্য তাদেরকে তৈরী করেছেন এবং সে ধরনের আচরণই আশা করুন যে ধরনের আচরণ তাদের সাথে করেছেন।

"হযরত নুমান (রাঃ) বলেন, আমার পিতা [হযরত বশির (রাঃ)] আমাকে

নিয়ে রাসূল (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি নুমানকে অমুক অমুক জিনিস দিয়েছি। এ কথার পর নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এ ধরণের উপঢৌকন দিয়েছ? তিনি জবাবে বললেন, না। সবাইকে তো দেইনি। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। অতপর তিনি বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের নেক আচরণ করুক। বশির (রাঃ) জবাব দিলেন, কেন চাইবোন না। তিনি বললেন, তাহলে এ ধরণের করো না।" (আল-আদাবুল মুফরাদ)

এ হাদীসের এ অংশ বিশেষভাবে চিন্তা করার মতো। "তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের নেক আচরণ করুক।" অর্থাৎ শিশু আপনার আচরণেই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, পিতা-মাতার সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে।

শিশুর চরিত্র ও চাল-চলন গঠনে মাতা-পিতা ছাড়া অন্যান্য কারণও থাকে। শিক্ষা, পারিপার্শ্বিকতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা সবই নিজস্ব সীমায় ভাঙ্গা-গড়ার কাজে দায়িত্বশীল। কিন্তু এখানে শুধু পিতা-মাতার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। সন্তানদের কি কি অধিকার রয়েছে তা আলোচনা করা হবে।

প্রত্যেক মা'ই এটা চায় যে, তার সন্তান তার অন্তরের শান্তি এবং চক্ষু শীতলকারী হোক। দুনিয়া এবং আখিরাতে তার জন্য ইজ্জত ও আরামের মাধ্যম হোক। তার বংশ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হোক। আপনার এ আকাংখা নিঃসন্দেহে মর্যাদা পাবার যোগ্য। কিন্তু কোন আকাংখাই শুধু দোয়ার মাধ্যমে ফূরণ হয় না। আপনাদের দোয়া পবিত্র, আপনাদের আকাংখা পবিত্র; কিন্তু শুধু দোয়া আকাংখা অনুযায়ী সঠিকভাবে চেষ্টার হক আদায় না করলে তা কখনো সাফল্যের রূপ দেখবে না।

সন্তানের ভালো এবং উন্নত ভবিষ্যতের আকাংখা কে না করে থাকে। কোন মা এই আশা করে না যে, তার সন্তান খারাপ পথে চলুক? সন্তানেরা খারাপ কাজ এবং পথভ্রষ্টতায় কার না অন্তরে বাজে। সন্তান যদি লজ্জিত এবং ব্যর্থ হয় তাহলে কোন্ মা'র চক্ষু দিয়ে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত না হয়। আর সন্তনেরা সার্থক ভবিষ্যত দেখে কোন মা খুশিতে বাগ বাগ না হয়।

কিন্তু শুধু ভালো আবেগ-অনুভূতি তিয়েই উদ্দেশ্য সফল হতে পারেন না। সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন হলো তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া এবং তাদের অধিকার আদায়ের পুরো চেষ্টা করা। আপনি নিজের দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পালনের পরই সন্তানদেরকে অধিকার আদায়ের শিক্ষা দিতে পারেন। আপনি যদি তাদের কিভাবে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই না রাখেন তাহলে আপনি তাদের অধিকার কিভাবে আদায় করবেন।আর এটাও বাস্তব যে শিশুদের দায়িত্বাবলী সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পালন এবং তাদের অধিকারসমূহের হক আদায়ে যে উচ্চাঙ্গের নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলীর প্রয়োজন তা আল্লাহ পাক নিজের হিকমতের অধীন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরকেই কিছুটা বেশি দান করেছেন। ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানী, দয়া ও নম্রতা এবং ভালোবাসার মৌলিক গুনাবলী পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি দান করা হয়েছে। আর এ জন্যই তাদের উপর আল্লাহ পাক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনের জন্য ঐসব গুণাবলীর বেশি জন।

"হে আমার রব) তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান কর। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাছও পাবে।" বা বরকত পাবে–

অর্থাৎ ইয়াকুব (আঃ)-এর পরিবার থেকে দ্বীনের যে আলো প্রসারিত হয়েছিল তার ওয়ারিস হবে এবং সে আলো কখনো নির্বাপতি হতে দেবে না। সত্য কথা হলো, নেক সন্তান দুনিয়াতেও বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম এবং আখিরাতেরও অফুরন্তসওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে থাকে।

আপনার জীবদ্দশায় যদি সন্তানের মৃত্যু হয় এবং আপনি সে মৃত্যু শোক সবর ও ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য আখিরাতের সঞ্চয়, বেহেশতের ওসিলা এবং বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম হবে। এ সবরের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে বেহেশত প্রদান করবেন এবং সেখানে আপনার জন্য একটি বিশেষ ধরনের মহল তৈরী করবেন। সে মহলের নামই হবে "শুকুরের মহল।"হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

"যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রুহ কবজ করে নিয়েছ।

ফিরিশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ। কবজ করে নিয়েছি। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন তোমরা তার কলিজার টুকরার রুহ কবজ করেছ! ফিরিশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ, কবজ করেছি। এ সময় আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, অতপর আমার বান্দাহ কি বলেছে? ফিরিশতারা জবাব দেন, (পরওয়ারদিগার) তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে। এবং এ মুসিবতে সে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। এ কথা শুনে আল্লাহ পাক ফিরিশতাদেরকে তার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরীর এবং সে মহলের নাম "শুকুরের মহল" রাখার নির্দেশ দেন।"

"হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাশরীফ আনলেন। তিনি (সঃ) বললেন, যে মুসলমান দম্পতিরই তিনটি নাবালেগ শিশু মারা যায় তাহলে এ শিশুরা কিয়ামতের দিন বেহেশতের দরজায় দাঁড়িয়ে যাবে এবং যখন তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশের কথা বলা হবে তখন নিস্পাপ শিশু জবাব দেবে যে, যতক্ষণ আমাদের মাতা-পিতা বেহেশতে দাখিল না হবে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে যেতে পারি না। তখন আল্লাহ নির্দেশ দেবেন যে, যাও তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা সকলেই বেহেশতে যাও।" (তিবরাণী)

সন্তানের জীবদ্দশায় আপনি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্যে এমন এক সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে যার সওয়াব দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত আপনার আমলনামায় লিখা হতে থাকবে। মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করতেই মানুষের আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি নেক সন্তান রেখে যায় তাহলে তা এমন এক নেক আমল হবে যার সওয়াব লিখা হতে থাকে। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

"হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন মাইয়্যেতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আর্শ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কেমন করে হলো? আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা যে, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেছেন।"

"হযরত ইবনে সিরীন (রাঃ) বলেন, একরাতে আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর খিদমতে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি দোয়ার জন্য হাত

উঠালেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আবু হুরায়রাকে ক্ষমা কর। হে পরওয়ারদিগার! আবু হুরায়রার মাকে ক্ষমা কর এবং পরওয়ারদিগার! সে সকল লোককেও ক্ষমা করে দাও যারা আবু হুরায়রা ও তার মার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। সুতরাং আমরা বরাবর হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং তার মার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে থাকি। যাতে আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর দোয়ায় শামিল থাকি।" আমরা সবাই–

মুসলমান মহিলা চিন্তা ও করতে পারে না যে, সে নিজের নিষ্পাপ শিশুকে নিজের হাতে হত্যা করে ফেলবে। ইসলাম এ মারাত্মক পাপ নির্মূল করার জন্য একদিকে পিতা-মাতার অন্তরে মানব জীবনের মর্যাদার গভীর অনুভূতি এবং সন্তানের মর্যাদা ও মূল্য সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে সন্তান হত্যাকে এত সঙ্গীন পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যে, তাকে শিরকের পর জঘন্য গুণাহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে।

"(হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন যে এসো আমি তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন। তার সাথে কাউকে শরীক করো না। এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করা ও দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না।" (সুরায়ে আল-আনায়াম ঃ ১৫১) সন্তানের রিজিক আমি আল্লাহতো প্রধান করি।

নবী করীম (সঃ) এ ভয়ানক যুলুম থেকে সমাজকে পবিত্র করার উপর এত গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন যে, বাইয়াতে আকাবাতে তিনি সর্বপ্রথম আনসারদের নিকট থেকে যেসব জরুরী বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল, তারা যেন সন্তানদেরকে হত্যা না করে। রাসূল (সঃ)-এর দরবারে যেসব মহিলা হাজির হতেন তাদের নিকট থেকেও তিনি সন্তান হত্যা না করার ওয়াদা নিতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যে সকল মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের নিকট থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল তার এক দফায় সন্তান হত্যা না করার ওয়াদা সন্নিবেশিত ছিল। ঈদের সাধারণ সমাবেশে তিনি মহিলাদের এলাকাতে তাশরিফ নিতেন এবং তাদের নিকট থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে এ ব্যাপারেও ওয়াদা নিতেন।

আল্লাহর নিকট হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মর্যাদা

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মর্যাদা আল্লাহর নিকট এ পৃথিবীর সকল রমণীদের মধ্যে হতে অধিক। আর অধিক মর্যাদার অধিকারিণী হবে না কেন? তিনি তো পার্থিব জগতের সকল আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করে হার হামেশা তার ইবাদতের মশগুল থাকতেন। কোন সময়ই ইবাদত পালনে অলসতা করতেন না। সর্বদাই তার হৃদয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় জাগ্রত থাকত। বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালা তাকে নারী জাতির উত্তম নমুনা হিসেবে দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওরসে নারী কুলের শিরোমনি হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কোলে পাঠিয়েছেন। তিনি দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় চির শান্তিময় বেহেশতের সুসংবাদ পাওয়ার পরও কোন সময়ই ইবাদত বন্দেগীতে অলসতা করতেন না। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরেই হযরত ফাতেমা (রাঃ) জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

কোন এক বর্ণনা থেকে জানা যায় হযরত হুরাইরা (রাঃ) ইসলাম দীক্ষিত হওয়ার কারণে তাকে তার মা বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করত। কারণে তিনি বাদ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথেও দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করে দেন। কিছু দিন পর তার মা তাকে বললেন, নবী মুহাম্মদের সাথে তোমার কখন দেখা করার কথা ছিল মায়ের জবাবে হুরাইরা বললেন আপনি যে দিন হতে গালিগালাজ করেছেন সেদিন থেকেই আমি তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আপনি যদি অনুমতি দিন তাহলে তার সাথে দেখা করার চিন্তা ভাবনা করব, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তার সাথে মাগরিবের নামায আদায় করে আপনার ও আমার জন্যে বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালার দরবারে গুনাহ মাপের জন্যে প্রার্থনা করব। হুরাইরা বলেন সত্যি, আমি আমার আম্মা জানের বিশেষ অনুমতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হই এবং তথায় উপস্থিত হয়ে মাগরিব ও ইশার নামায একই সাথে আদায় করি। নামায আদায়ান্তে তিনি রওয়ানা হলেন আমিও তার পেছনে পেছনে রওয়ানা হলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে বললেন কে হুরাইরা? আমি আমার সকল ঘটনা খুলে বললাম।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন আমি দোয়া করি রাব্বুল আলামীন যেন তোমার আম্মা ও তোমাকে যেন ক্ষমা করে দেন। এর কিছুক্ষণ যেতে না

যেতেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন, তুমি কি আমার সাথে কাউকে কথা বলতে শুনেছ? তখন আমি (হুরাইরা) বললাম 'হ্যাঁ' আমি কাউকে কথা বলতে শুনেছি। তখন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তিনি হলেন আল্লাহ প্রদত্ত একজন ফেরেশতা, বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাকে সালাম করার জন্য এবং বেহেশতের যুবকদের সর্দার ইমাম হাসান ও হুসাইন এবং আমার কলিজার টুকরো হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিশ্ব রমণীদের নেতা এই খোশ খবর দেয়ার জন্যেই তিনি এই প্রথম পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এর আগে এ ফেরেশতা আর কখনো পৃথিবীতে আগমন করেননি।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার কাছে কত প্রিয় ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাই একথা নিম্ভিাবে বলা যেতে পারে যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে অনেক। তবে এ কথাও ...াবে উল্লেখ্য যে হযরতের আহলে বায়তের মধ্যেও অনেক ফযীলত ... শামিল থাকলেও তার মধ্যে হতে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মর্যাদা ...ত্ব ছিল সর্বাধিক। আল কোরআনে-ইরশাদ হচ্ছে–

...হে আহলে বায়াত, বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালাতো চান তোমাদের নাপাকী দূর করে তোমাদেরকে ভালভাবে পবিত্র করতে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের পবিত্র এ আয়াতটি নারী কুলের শিরমনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ফযীলত ও মর্যাদা বিশেষভাবে প্রমাণ করে।

কোন এক বর্ণনায় আদুর রহমান ইবনে আবু নুয়াইম আবু সাইদ আল খুদরীর উদ্বৃতিইদয়ে লিখেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন–

জান্নাতে রমণীদের সর্দার হবেন মারইয়াম তারপর ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, এরপর খাদীজা, তারপরে ফেরাউনে স্ত্রী আছিয়া। বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালা নারী সমাজের মধ্যে নবীর (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে যে ফযীলত বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তার কোন নযীর নেই। হযরত ফাতেমার ফযীলত মর্যদা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। 'দুনিয়ায় স্ত্রীদের মধ্যে হতে তোমাদের অনুকরণের জন্যে মরইয়ম বিনতে ইমরান, নারী কুলের শিরোমণি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া। যাইহোক হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার জীবনের সকর কাজ কর্মের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে

অনুকরণ করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)' বলেন আমি কথা-বার্তা, বাচন-ভঙ্গি, চাল-চলন, হাসি-তামাশা ইত্যাদিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে নবী (সাঃ)-এর আদরের মেয়ে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর চেয়ে সাদৃশ্য পূর্ণ আর কাউকে দেখতে পায়নি। কোন সময় কোন কারণে যদি হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আগমন করতেন তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং তার কপালে চুমু খেয়ে নিজের স্থানেই আসন দিতেন।

কেবল যে আল্লাহর নবী (সাঃ) হযরত পাতেমা (রাঃ) কে ভালবাসতেন ও সম্মান করতেন তা নয়। বরং নবী (সাঃ)-এর কনা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে এরূপভাবে ব্যবহার করতেন। কোন এক বর্ণনায় উম্মে সালমা বলেন, কথা-বার্তা, উঠা-বসা, চাল-চলন ও বচন-ভঙ্গিতে নবীয়ে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র চেহারার দিকে দৃষ্টি করলে দেখা যেত তার পবিত্র সুন্দর চেহারার সাথে নারী সম্রাট ফাতেমার চেহারার অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। হাফেযে হাদসি ও কদর সাহাবা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা কোন এক বর্ণনায় বলেন– আমার নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) পরে সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে উত্তম আর কাউকে দেখতে পায়নি; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মর্যাদা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন–

'আমার কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমার পবিত্র দেহের একাংশ, তাকে যে নারাজ করবে, সে যেন আমাকে নারাজ করল।'

হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিশ্ব রাসূলের আদরী কন্যা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানেই তিনি লালিত পালিত হয়েছেন। তার পবিত্র জীবনের কোন অধ্যায়ে লাত উজ্জার পূজা পাটের বিন্দুমাত্র দাগও লাগে নি। তিনি তার জীবন প্রভাতের শুরু হতেই বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালার প্রতি দৃঢ় ঈমান আনয়নের পর আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম পালনের মধ্যে দিয়েই সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত গভীর, কোন অপশক্তি তাকে আল্লাহর বিশ্বাস থেকে হটাতে পারতেন না। পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কুরাইশ বংশের লোকদেরকে আহবান করে বলেছিলেন তোমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রতি পালকের দিকে আহবান করতেছি। তোমরা যদি পরকালের ভয়াবহ শাস্তি হতে মুক্তি পেতে

চাও তা হলে তোমরা নিজেদেরকে কঠোর আগুন হতে মুক্তি কর। ঐ মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র মুখের কথা মুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলে উঠলেন, হে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, আপনি একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করুন যে আমি আপনার আহবানে পরিপূর্ণ সারা দিচ্ছি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর এমন কথা যেমনিভাবে বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি তার গভীর ঈমানের পরিচয় বহন করে তেমনি ভাবে সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি তার আনুগত্যের উজ্জল প্রমাণ বহন করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বংশের সংরক্ষণ

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর দ্বারা কেবল নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং বী [illegible]ংশের সংরক্ষণও তার মাধ্যমে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে [illegible] সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে হতে পুত্র সন্তান ইব্রাহিম, [illegible], আবদুল্লাহ ছোট বয়সেই দুনিয়া হতে বিদায় নেন, আর কন্যা [illegible]ঃ) [illegible]নদের মধ্যে হতে উম্মে কুলসুম যয়নব, রুকাইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় দুনিয়া হতে বিদায় নেন। সন্দানদের মধ্যে হতে কেবলমাত্র হযরত ফাতেমা (রাঃ)-ই বেঁচে ছিলেন। নবী কন্যা হযরত ফাতেমার (রাঃ) গর্ভেই প্রিয় নবীর প্রিয় দুই নাতী ইমাম হাসান (রাঃ) হুসাইন (রাঃ) এবং এক নাতনী যয়নব নবী বংশের অস্তিত্ব রাখার মত সুগন্ধিময় তিন ফুল। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় এই তিনের মাধ্যমেই নবী (সাঃ) পরিবারের বংশের ক্রমধারা ও ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং পরিবারের বংশের ক্রমধারা ও ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং আল্লাহ চাহে তো থাকবে। বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল কোরানে ইরশাদ করেন–

আল্লাহ তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করে তোমাদের পবিত্র করণের ইচ্ছা করেন। প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ বহু সংখ্যক হাদীসের উদৃতি টেনে নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং হাসান হুসাইনকে এই পবিত্র আয়াতে নবী (সাঃ) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে অভিমত পোষণ করেছেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর পোশাক পরিচ্ছেদের নমুনা

হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) আনহার দৈহিক অবয়ব অতি দ্রুত বর্ধনশীল ছিল। তার বয়স যখন মাত্র ১১ বৎসর হয়েছিল তখনই তিনি বালেগা হয়েছিলেন। বাল্যকালে তার শরীরের গঠন খুবই হালকা ছিল তবে তিনি উজ্জল সুন্দরী ছিলেন। তবে বয়ঃ বৃদ্ধির সাথে সাথেই তার দেহ ও স্থূলভারী হয়েছিল। তার পবিত্র শরীর মুবারকের রং ছিল লালাভ সাদা অর্থাৎ লাল ও হলুদে মিশ্রিত রংয়ের।

তবে একথা নিশ্চিত সত্য যে তার পবিত্র চেহারা মুবারকের রং ছিল রাসলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেহারা মুবারকের মত সুন্দর। বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে একথাও জানা যায় যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর শরীরের গঠন প্রকৃতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মতই ছিল। তার হাত, পা, আঙ্গুল, কপাল ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মতই ছিল। এক বাক্যে বলা যেতে পারে যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) অত্যন্ত সুশ্রী ও পরমা রূপসী ছিলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) পার্থিব জগতের ভোগ বিলাস ও সাজ সজ্জার লালিত ছিলেন না, কেবল মাত্র যেটুকু প্রয়োজন না হলেই চলে না ততটুকু পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায় তিনি যোহুদ (সংসারের প্রতি বিরাগ) এবং করাআত (অল্পে তুষ্টি) বিশেষতঃ কেবলমাত্র একটি সেলোয়ার ও একটি কামিজ অতিরিক্ত হিসেবে নিজের কাছে রাখতেন। একেই সময় সুযোগ করে ধৌত করে পালাক্রমে পরিধান করতেন। তিনি বেশি দামের কাপড় বেশি পড়তেন না। তিনি সব সময়ই মোটা কাপড় পরিধান করতে পছন্দ করতেন। আবার অনেক সময় স্বর্ণেরহারও গলায় দিয়েছেন। মাঝে মধ্যে স্বর্ণের আংটিও ব্যবহার করতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহের মোহরানা

রাসুলূল্লাহ (সাঃ)-এর জামাতা শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি যখন বিবাহের পয়গাম নিয়ে যাওয়ার মনো বাসনা করি; ঠিক ঐ মুহূর্তে আমার কাছে বিবাহের মহরানা আদায় করার মত তেমন কিছু ছিলনা। আমি মহরানা নিয়ে খুবই চিন্তায় ছিলাম। এমনি সময় হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দিয়ে তোমার বিবাহের মহরানা আদায় করতে চাও? তখন আমি জবাবে বললাম, আমার নিকট আদায় করার মত কিছুই

নেই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি তোমাকে সেদিন যে লৌহ বর্মটি দিয়েছিলাম তা কি করলে? তখন আমি জবাবে বললাম সে লৌহবর্ম আমার নিকটেই আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সেই লৌহ বর্মটিই মহরানা হিসেবে দিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ও কথা অনুযায়ী আমি সেই লৌহ বর্মটি পাতেমা (রাঃ) কে দেই। মূরত তার মূল্যে হবে চরশ দিরহাম। তবে অন্য এক বর্ণনায় চারশ আশি দিরহাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সকলেই এক মত পোষণ করেন যে, নবী (সাঃ)-এর হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মহরানা চারশ আশি দিরহামের মোটেও কম ছিলনা। তবে জীবন চরিত কারা এ ব্যাপারে নানা ধরনের মত পরিবেশন করেন। কেহ কেহ বলেন ঐ সময় নবী জামাতা হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে কেবলমাত্র একটি লৌহ বর্মই ছিল। তাই হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে মহরানা হিসেবে দেয়া হয়েছে। আবার কেহ কেহ বলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর বিবাহে চারশ আশি দিরহাম মহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক তৃতীয়াংশ খোশবু কেনার কাজের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশ দেন। কেহ কেহ বলেন ইসলামের বীর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর বিশেস নির্দেশে নবী (সাঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে গৃহে তুলে নেয়ার পূর্বে মহরানার বিনিময়ে উক্ত লৌহ বর্মটিই তার পবিত্র হাতে তুলে দেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আদত ও আখলাক

তাইতো বলা হয়ে থাকে ভাল লোকের সান্নিধ্যে খারাপ লোকও ভাল হয়ে যায়। হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে আল্লাহ তায়ালা নারী জাতির উত্তম নমুনা হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত আদর্শ মহা মানবের শিক্ষাও সংসর্গ তার চরিত্রকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। স্ত্রী জাতির স্বভাব ও ব্যক্তিগত আচরণের প্রতি তাকালে দেখা যায় অল্পে তুষ্ট থাকা সাধারণতঃ স্ত্রী জাতির স্বভাব বিরুদ্ধ। সহীহ হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন আমি জাহান্নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলাম জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে স্ত্রী জাতীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। স্ত্রী জাতিরা সবেচেয় জাহান্নামে বেশি কেন? এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন তাদের বিশেষ

দোষ হল তারা কোন সময়ই স্বামীর শোকর গোজারী করে না।

তবে দুনিয়ার সমস্ত স্ত্রী জাতিরা এই দোষের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকলেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা নারী জাতির উত্তম নমুনা হযরত ফাতেমাতুজ জোহরার (রাঃ) চরিত্র এই দোষ হতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ছিল। অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত ও নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) আদর্শ ও চরিত্রকে বিসর্জন দিয়ে সুখের পথ খুঁজেনি। বরং শত অভাব অনাটনের মধ্যে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শের ওপর সর্বদা অটল ছিলেন। মানুষের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়। অভাব অনটন এ বিপদ আপদে যখন পড়ে তখন তারা আল্লাহ রাসূলের পথ ও আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। অন্যকে দোষারূপ করে।

আদর্শের প্রতীক নারী জাতির উজ্জল উজ্জল লক্ষ্য হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রাঃ) অভাব অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও কোন অবস্থাতেই কোন বিষয়ে স্বামীর কাছে আবদার করেননি। আরাম আয়েশ ভাল বাসস্থান, উন্নত মানের পোশাক পরিচ্ছেদ দাসী অলংকার, সুখ অট্টালিকা, নিয়মিত পেট ভরে ভাল খাদ্য খাওা, দাস-দাসীর সেবা গ্রহণ করা এক কথায় সুখে থাকার পার্থিব উপভোগ্য নেয়ামত তিনি জামাতা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হতে পাননি। পাবার জন্যে কোন সময় বিশেষভাবে আবদার করে স্বামীর মানসিক খারাপও করেননি।

তার জীবনে এমনও দেখা গেছে কোথা হতে কোন দাসী পোশাক ও অংলকার উপহার হিসেবে পেলে তা নিজের সংসারের জন্যে না রেখে পিতার নিকট বায়তুল মালে পাঠয়ে দিতেন। নিজের অভাবী সংসারের মধ্যে যা কিছু বাস করার মত ছিল তা হতে বেশিরভাগ জিনিস অসহায় গরীব মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এমনকি অনেক সময় এমনও দেখা গেছে নিজের সামনের খাদ্যগুলো গরীব মিসকীনদের মাঝ দান করে নিজে শুধু পানি পান করে থাকতে একাধারে তিন দিনও ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে থাকতেন।

হযরত আলীর (রাঃ) গৃহে কোন সময়ই তৃপ্তিমত আহার করতেন না। যদি কোন সময় কোন স্থান হতে ভালখাদ্য দেয়া হত তখন খাদ্য দেখা মাত্রই কেঁদে দিতেন। কেদে দেয়ার কারণ ছিল তার পিতা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর তার মান্যবর স্বামী ইসলামের বীর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ) গোটা জীবন অনাহারে অর্ধাহারে পেটে পাথর বেঁধে থাকতেন। যার কারণে

তার সামনে ভাল খাদ্য উপস্থিত হলেই সে স্থির থাকতেন পারতেন না। তিনি তার জীবনের প্রতি মুহূর্তেই পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও স্বামী হযরত আলী (রাঃ) কে সর্ব ক্ষেত্রেই পূর্ণ অনুসরণ করে চলতেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ হযরত আলী (রাঃ)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল মধুর সম্পর্কে ভরপুর। তাদের দাম্পত্য জীবনে কোন সময়ও যদি কোন টুকিটাকি নিয়ে মনো মালিন্য দেখা দিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা মিটিয়ে দিতেন। নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) স্বামীকে খুশী রেখেই দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) কেবল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও স্বামীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার উত্তম সম্পর্ক দেখতেন না।

তিনি আল্লাহ তায়ালার রেজানন্দি হাসিলের নিমিত্তে সকলের সাথেই ভাল সম্পর্ক রেখে চলতেন। এমনকি তিনি তার জীবনে কোন সময়ই বিমাতাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন না, কোন সময়ই টুকিটাকি নিয়ে তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য করতেন না। এছাড়া বিমাতাদের পূর্বের স্বামীর ঘরের ছেলে মেয়েদের সঙ্গেও কোন সময় খারাপ ব্যবহার করতেন না। বরং তাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতেন। শুধু সম্পর্কই নয় তাদের প্রায়ই খোঁজ খবর নিতেন। তার চেয়ে বয়সে যেসকল বোনেরা বড় তাদেরকে সম্মান করতেন এবং তাদের সঙ্গে মায়ের সমতুল্য ব্যবহার করতেন। বোনদের স্বামী এ আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সর্বদা ভাল সম্পর্ক রাখতেন। তাদের সঙ্গে কোন সময়ই অশোভনীয় আচরণ করতেন না। তার আচার ব্যবহারে ভগ্নিপতিসহ তার পরিবারের সকলেই খুশী ছিলেন। কেবল বড় বোনদেরকে ভাল জানতেন নয় ছোট বোনদেরকে স্নেহ আদর করতেন, এমনকি তাদের বিভিন্ন চাহিদা শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী পূরণ করতে চেষ্টা করতেন।

তিনি জীবনে কারো সাথেই দাম্ভিকতাসহ কথা বলতেন না। এবং এমন কোন আচরণের মধ্যে লিপ্ত হত না যে আচরণের অহংকার। বরং তিনি সকলের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে বিভিন্ন কাজ করতেন। এমনকি তিনি নবীয়ে দোজাহান নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা সুপারিশীর কাণ্ডারী হযরত মাহাম্মদ (সাঃ)-এর আদরের কন্যা এবং ইসলামের বীর সৈনিক শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রিয় মা স্ত্রী ও ইমাম হাসান হুসাইনের মাতা হিসেবে কোন সময়ই অহংকার বা গর্ব করতেন না। বরং তিনি কথা কার্যের মাধ্যমে এমন ভাব প্রকাশ করতেন মনে হতো যেন তিনি এ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে

সাধারণ লোক। যার কারণেই পার্থিব জগতের সকল কাজ কর্ম সেরে সুযোগ পেলেই আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতেন। আশ্চর্য হবার কথা হলো তিনি দুনিয়ায় জীবিত থাকা কালীন সময়ে বেহেশতের সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনে ও ইবাদত বন্দেগীতে অলসতা করতেন না।

কোন সময়ই নিজেকে আবেদা, সাদেকা মনে করতেন না। বরং তিনি সর্বদা নিজেকে ছোট বলে মনে করেই সর্বদা ইবাদত বন্দেগী করতেন। তবে নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কেবল নিজের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যেই আল্লাহর কাছে বলতেন তা নয় বরং তার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর সকলের অভাব অনটন ও কল্যাণের কথা বলতেন। তিনি মহিলাদের দাবি দাওয়া পূর্ণ করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। আর তার নিকট যে সমস্ত দাবি প্রকাশ করা হত তা পূর্ণ করার জন্যেই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতেন। কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট কোন দেশী বিদেশী মহিলা তাদের ব্যক্তিগত দাবি পেম করার জন্যে হযরত ফাতেমার গৃহে আসলে তিনি তাদের কে সম্মানের সাথে পিতার নিকট নিয়ে যেতেন।

তাদেরকে পিতার সামনে উপস্থিত করিয়ে তাদের পক্ষ্য থেকে তাদের দাবি সমস্যার কথাগুলো হযরত ফতেমা (রাঃ) আদরের সাথে নিজেই বলতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল কোন সময়ই নিজের অভাব অভিযোগের কথা আল্লাহর নবী (সাঃ) কে জানাতেন না। বরং অনেক সময় আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সংসারের হাল অবস্থা জানতে চাইতেন। তখন তিনি জবাবে বলতেন আল্লাহ রহমাতে ভাল আছি, কিন্তু সময়ই সংসারের অভাব অনটনের কথা প্রকাশ করতেন না। হযরত ফাতেমা (রাঃ) যখনই কোন সমস্যা বা বিপদের মধ্যে পড়তেন তখন অস্থির হতেন না বরং মানসিক শান্তি নিতেন এ ভেবে যে আমার সমস্যা ও বিপদ আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে নয়। বিধায় তার খুশীতেই খুশী থাকা উচিত। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিপদ আপদ ও সমসার মধ্যে ও আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে যেতেন না।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর হতেই তার প্রতিটি নির্দেশ পালনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে সচেষ্ট থাকতেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর হতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া স্বরূপ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সর্বদা স্মরণ করে স্বামী গৃহে জীবন

যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয় উপদেশটি ছিল "হে ফাতেমা স্বামীর প্রতিটি নির্দেশকে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে তা পালনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। কেননা স্বামীর সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তায়ালা খুশী। হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপদেশকে স্মরণ করেই জীবন চলার প্রতিটি মুহূর্তে হযরত আলী (রাঃ)-এর আনুগত্য এবং তার মন সন্তুষ্টি ও সম্মতি লাভের জন্যে দিবারাত চেষ্টা চালিয়ে যেতেন নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কেবল স্বামীর নির্দেশ পালনের মধ্যে দিয়েই তার মনতুষ্টি অর্জন করতেন না বরং তার পবিত্র চেহারার মধ্যে যখন পেরেশানী কিংবা মলিনাতা দেখা মাত্রই তা দূর করার জন্যে পাগল পারা হয়ে যেতেন।

হযরত আলী (রাঃ) সারা দিনের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যখন গৃহে ফিরতেন তখন তার শরীর হতে পরিশ্রমের ঘাম ঝরঝর করে পড়ত, কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাঃ) তখন মধুমাখা ব্যবহার ও স্বামী সেবার মাধ্যমেই দুঃখ কষ্টের কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে যেতেন অক্লান্ত অন্য দিকে হযরত আলী (রাঃ) সারাদিনে পরিশ্রমের পরে গৃহে ফিরে গৃহে ফিরে নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর সংসারিক হাল হাকিকত জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাঃ) এমন কোন কথা মুখ হতে উচ্চারণ করতেন না যাতে হযরত আলী (রাঃ) হৃদয়ে কষ্ট পেতেন। নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কেবল তার গৃহেই আদর্শ নারীর ভূমিকা পালন করতেন তা নয় বরং গৃহের বাইরেও ছিলেন একজন উত্তম সেবিকা। তিনি কোন সময়ই গরীবও অভাবী বলে কাউকে ছোট ভাবতেন না, বরং অসহায় অভাবীদেরকে ভালবাসতেন ও যথাসাধ্য তাদের সাহায্যে করতে চেষ্টা করতেন। আর গরীব অভাবীদেরকে ভালবাসার কারণ হল তিনি নিজেইতো অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করেছেন যার কারণেই গরীব অভাবীদেরকে দেখা মাত্রই তার পবিত্র চেহারা মুবারক মলিন হয়ে যেত। যে পর্যন্ত তাদের সাহায্যে সহযোগীতা না করতে পারতেন সে পর্যন্ত তাঁর হৃদয়ে কোন তৃপ্তি পেতেন না। নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করে গরীব, দুঃখীদেরকে সাহায্য করার জন্যে কিভাবে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হল আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক ধনাঢ্যবান মুসলীম নর-নারী আছেন যারা অগাধ সম্পদের মালিক কিন্তু তারা তাদের সুখ শান্তি নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন কিন্তু তাদের গরীব আত্মীয়, পাড়া-পড়শী অনেকেই এক

মুঠো ভাতের জন্যে পাগল পারা হয়ে ঘুরছে। তারা তাদের একটু অনুভূতি পেলেই জীবিকার পথ খুঁজে বের করে খোদায়ী জীবন যাপনের পথ বেছে নিতে পেরতেন। কিন্তু তা না করে আমাদের সমাজের কতিপয় ধনাঢ্যবান ব্যক্তির বিশেষ দিন পালনের মধ্যে দিয়ে যে অর্থ ব্যয় করেন, তার সামান্য কিছু অংশ দিয়েও যদি মুসলিম অসহায় গরীব অনাথদের সাহায্য করতেন তাহলে তারা এক মুঠো ভাত খেয়ে আল্লাহ চাহেতো ইসলামী জীবন যাপন করার পথ খুঁজে নিতে পারতেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মত গরীব অনাথদের সাহায্য করার মন মানুসিক সৃষ্টি করে দেয়। নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর আখলাক ও আদত লিখে পুস্তিকার পাতা ভরে তালাশ করতেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই কারো দুর্নাম করতেন না। তবে গুণ প্রকাশ করতেন।

বর্তমান যুগে সৎ কাজের নিন্দা করা নারী জাতির প্রকৃতিগত স্বভাব। কেননা অনেক নারীই আপন মায়ের সঙ্গে সৎ মায়ের একত্রে বসবাস এবং তাদের পিতার অর্থ সম্পত্তিতে সৎ মায়ের অংশ ইত্যাদি কোন নারী জাতি বরদাশত করতে পারে না বরং যেকোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু নারী কুলের শিরোমণি হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিমাতাদের প্রতি আন্তরিকতা, সম্মান উদারতা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন তা ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করলেও তার স্বভাব ছিল দান দক্ষিণা বা অনুগ্রহ খুবই কম গ্রহণ করতেন। তবে সময় সাপেক্ষে গ্রহণ করলেও তার বিনিময়ে কিছু না কিছু দিয়ে দিতেন। তবে কোন সময় কারও নিকট হতে দামী কোন পুরস্কার পেলে তা নিজে গ্রহণ না করে বায়তুল মালে দিয়ে দিতেন, কেহ যদি তাঁর গুণ ও প্রশংসা তাঁর সামনে করতেন তাহলে তিনি খুবই রাগ হতেন এবং তিনিও কারও সামনে তার কোন সমস্যার ফল প্রকাশ করতেন না এবং শত কষ্ট হলেও নিজের দুঃখের কথা কারো কাছে বলতেন না তবে অন্য কারো দুঃখের কথা শুনা মাত্রই তা দূর করার জন্যে নিজশক্তি সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা করতেন এবং তার স্বভাবের মধ্যে বিশেষ গুণ ছিল নিজে না খেয়ে ছেলে মেয়ে স্বামীদের খেতে দিতেন এবং তাদের খাওয়ার মধ্যেই তৃপ্তি পেতেন।

আর কেহ যদি তাকে হাদিয়া স্বরূপ ভাল খাদ্য দিতেন তা তিনি কোন সময়ই নিজে খেতেন না। পিতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও বিমাতাদের জন্যে

নিয়ে যেতেন বা কারও মধ্যে যে পাঠিয়ে দিতেন। কোন কোন বর্ণনা হতে জানা যায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বয়সে ৫ কিংবা ছয় বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাঃ)সর্বক্ষেত্রেই হযরত আয়েশা (রাঃ) কে মা বলে ডাকতেন এবং সর্ব ক্ষেত্রেই মায়ের মত মর্যাদা প্রদান করতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) জীবন চলার পথে ছোট বড় সকলের সাথেই ভাল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতেন। সকলের সাথে কোমল ভাষায় মিষ্টি সুরে কথা বলতেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যেমনি স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন তেমনিই তিনি তার উত্তম চরিত্র ও উত্তম আদর্শ দ্বারা প্রতিটি মুসলিম হৃদয়ের মন কেড়ে নিয়ে ইতিহাসে পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

স্বামীর সংসারে ফাতেমা (রাঃ) কাজ কর্ম করতেন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা নয়নের মনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ) চিরশান্তিময় বেহেশতের সমস্ত রমণীদের নেত্রী হবে। বেহেস্তের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠাতা রমণী হয়ে বিবাহের পরে যখন তিনি হযরত আলীর (রাঃ) অভাবী সংসারে গেলেন তখন তিনি নিজ হাতেই সকল কাজ কর্ম করতেন, বরং কোন সময়ই নবীর (সাঃ) কন্যা বলে গর্ব করে সাংসারিক কাজের প্রতি অনীহা পোষণ করতেন না বরং তারা সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ার লক্ষ্যে পরস্পরে এ কথায় সিদ্ধান্ত করলেন যে নবী (সাঃ) জামাতা হযরত আলী (রাঃ) বাহিরের সকল কাজ কর্ম আঞ্জাম দিতেন, আর হযরত ফাতেমা (সাঃ) সাংসারিক সকল কাজ কর্ম আঞ্জাম দেবেন। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে সিদ্ধান্তের ধারা অনুযায়ী হযরত ফাতেমা (রাঃ) বহু কষ্ট ক্লেশের মধ্যে সাংসারিক কাজের আঞ্জাম দিতেন, তবে এখানে উল্লেখ বিষয় হল বর্তমান যুগের আধুনিক মহিলাদের মত এত সুযোগ সুবিধা পেত না। তৎকালে বর্তমান যুগের মত ছিল না যে বিদ্যুৎ এর সুইজে টিপ দিয়ে রান্না করা হয়ে যায় বরং সেই যুগে অতি কষ্ট করে চরখার দ্বারা আটা পিষে খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করতে হত; শুধু তাই না কাষ্ঠ সংগহ করতে হত, এমনকি চুলা ও তৈরী করতে হত তারপরে রুটি পাকাতে হত কাজ ছিল। এত কষ্টের মধ্যে সাংসারিক সকল কাজ করেও ফাতেমা (রাঃ) চেহারায় মলিনতার ছাপ দেখা

যেতনা বরং তিনি হযরত আলীর (রাঃ) অভাবের সংসারের সকল কাজ কর্ম ভালবাসার সাথে মনের আনন্দে করতেন।

ইতিহাসের পাতা হতে জানা যায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঐতিহাসিক খায়বরের যুদ্ধে বহু গণীমতের সম্পদ অর্জন করলেন। যে সম্পদের মধ্যে প্রচুর গোলাম বাদীও ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সেই গণীমতের মাল সম্পদ সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে বিতরণ শুরু করলেন; এদিকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে কেহ বলল আপনিও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে যান, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন আপনাকে একটা কাজের লোক বা বাদী দিয়ে দেন। যাইহোক হযরত ফাতেমা (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর গৃহে গিয়ে বললেন আপনি। আব্বাজানে গৃহে আসলে আমার হয়ে একটু বলবেন যে আটা পিষতে পিষতে আমার হাতে ফোসঁকা পড়ে গিয়েছে; শুধু হাতে নয় কলস উঠাতে উঠাতে কোমরে সপ্ট পড়ে গিয়েছে, যেহেতু এখন গণীমতের মালের প্রচুর গোলাম বাদী এসেছে, তিনি যদি তা হলে আমাকে একটি গোলাম বাদী দিয়ে দেন তাহলে আমি এ ধরনের কষ্ট একটি নিষ্কৃতি পেতাম, হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার হৃদয়গ্রাহী কথাগুলো ব চলে গেলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহে আসার পর উম্মুল মুমমীন হযরত আয়েশা (রাঃ) ফাতেমার হয়ে তার মনের আবেগ জড়ান কথাগুলো বললেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) মুখের কথাগুলো শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তড়িৎ গতিতে ফাতেমার গৃহে গেলেন। গৃহে পৌছে মেয়ের দুঃখ কষ্টের শান্ত্বনা দিয়েই বললেন হে ফাতেমা তুমি আমার কাছে গোলাম বাদীর দরখাস্ত করেছ। কিন্তু যে পর্যন্ত মদীনাবাসীর প্রতিটি ঘরে গোলাম বাদী না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নবী মুহাম্মদের (সাঃ) আদরের দুলাল কলিজার টুকরো হযরত ফাতেমার গৃহে গোলাম বাদ থাকবেনা। এটা আমি পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ মুহূর্তেই নবী কন্যা হযরত ফাতেমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন হে ফাতেমা, মনে রাখবে আল্লাহর কাছে প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ হতে বের হয়ে আসল।

'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকের অধীনে যা কিছু আছে সকল সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবে। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ

একটু চিন্তা কর দেখুন আদর্শের প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গোলাম বাদী মেয়েকে তো দিলেন না বরং বিভিন্ন উপদেশমূরক কথার মাধ্যমে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলেন্নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) মনে দুঃখ নিলেন না বরং নিজের অহেতুক আপত্তির জন্নে আফসুস করলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) অভাবী স্বামীর গৃহের সকল কাজ কর্ম নিজেই করতেন কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল কোন সময়ই ফাতেমা (রাঃ) নবী জামাতা হযরত আলীকে (রাঃ) মুহূর্তের জন্যে এ অভিযোগ করেনি যে আপনার সংসারের কাজ কমূ করা ামার একারপক্ষে সম্ভব নয় আমাকে একজন গোলাম দিন। বরং তিনি স্বামীগৃহের সকল কাজ কর্ম করে সন্তান-সন্ততির স্বামীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে মোটেও কাপণ্য করতেন না। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখনই ফাতেমার গৃহে তাকে দেখতে আসতেন তখন তার খবরা খবর জানার পরে কম বেশি জীবন চলার পথেয় হিসেবে উপদেশ দিয়ে যেতেন। প্রায়ই ফাতেমা (রাঃ) কে কাছে ডেকে তার পাশে বসায়ে মাথায় হাত বুলায়ে বলতেন হে মা, স্ত্রীলোক স্বামীর ঘর ও ান সন্তরি নেগাহবান।

হযরত আলী (রাঃ) কে উপদেশ দান

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখনই সময় সুযোগ পেতেন তখনই ফাতেমা (রাঃ) গৃহে যেতেন। ফাতেমা (রাঃ) কে বিভিন্ন উপদেশ দিতেন জীবন চালাতে পারে। তদ্রূপ জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কেও উপদেশ দিতেন কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী। স্ত্রীলোক যেমন স্বামীগৃহে রক্ষণাবেক্ষণকারিনী, তেমনি পুরুষ তার পরিবারের সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও দায়িত্বশীলা।

এ প্রসঙ্গে ঃ 'পুরুষ তার পরিবারের সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও দায়িত্বশীল।'

প্রত্যেক পরিবারের ছেলে-মেয়ে স্ত্রী যারাই থাকে সকলের পর্যবেক্ষণ হল পুরুষ এই পরিবারের কর্তাকে কঠিন কিয়ামতের দিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে তোমার অধীনে বিবি বাচ্চা ছিল তুমি তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করেছ? কিভাবে দেখাশুনা করেছ? আল্লাহর নবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে সাংসারিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে এভাবে প্রায়ই বলতেন।

প্রিয়পাঠক পাঠিকাগণ একটু চিন্তা করে দেখুন। নবীর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও জামাতা হযরত আলী (রাঃ) কে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে কিভাবে আল্লাহ রাসূল (সাঃ) অবহিত করেছেন। তাদের তুলনায় আমরা কত যে নগণ্য। যা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভবনা। তারা যদি পরকালে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্নের ভয়ে অস্থির হয়ে যেতেন তাহলে আমাদের কতদূর এ ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত তা আপনারা নিজেরাই ভেবে দেখুন। অতীব দুঃখের বিষয় হলো আমাদের অনেক পরিবারের এমনও পিতা-মাতা রয়েছেন তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্মদাতা বটে কিন্তু তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে তারা অপরাগ। তাদের দায়িত্বহীনতা ও অলসতার জন্যে অনেক ছেলে-মেয়ের সোনার জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ তারা পরিবারের কর্তা হিসেবে ছোট থেকে যদি ছেলে-মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ও তারা সঠিক দ্বীনের ওপর আছে কি-না এ ব্যাপারে চিন্তা করতেন তাহলে সোনার ছেলে-মেয়েরা জাহান্নামের দিকে ধাবিত হত না। নামাজের সময় হলে অন্যদেরকে যেতনা বরং নামায পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে যেতেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাল কিয়ামতের ময়দানে পরিবারে ঐ পুরুষ কর্তাকে ঐ সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ইন্তেকাল

মানুষ মরণশীল। জন্মিলে মরতেই হবে। নবী রাসূল ওলী আওলীয়া কেহই মৃত্যুর হাত হতে রেহাই পায়নি। তদ্রূপ নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) মৃত্যুর হাত হতে রেহাই পায়নি। তবে যারা আল্লাহর প্রিয়জন তাদের মৃত্যু হল সেতু। কেননা মুমিনগণ এ মৃত্যু নামক সেতু পার হয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় সান্নিধ্য লাভ করবে। তাই মুমিনগণ কোন সময় মৃত্যুকে ভয় পায়না। বরং মৃত্যুর জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। যাই হোক নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) যে দিন দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন সেই দিন রাসূল্লাহ (সাঃ)-এর ইহধাম ত্যাগের পরে ছয় মাস কাল অতীত হয়ে গিয়েছিল। যে দিন নবী কন্যা হযরত ফাতেমা দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন ঐদিনটি ছিল হিজরী একাদশ সনের ৩রা রমযান। নবী জামাতা হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) উম্মে সালমা (রাঃ) কে ডেকে বললেন আপনি অতি সত্তর আমার গোসলের জন্যে পানি ও কাপড়

ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। সত্যি উম্মে সালমা (রাঃ) নবী কন্যা হযরত ফাতেমার কথাও নির্দেশ অনুযায়ী তড়িৎ গতিতে গোসলের সবকিছু তার সামনে উপস্থিত করলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) মনের খুশিতে জীবনের শেষ গোসল নিজেই করে নিলেন।

বিবি উম্মে সালমা (রাঃ) কোন এক বর্ণনায় বলেন ঐ দিন নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) যে সুন্দরভাবে গোসল করে ছিলেন এমন ভাবে করতে আর কোন দিন দেখি নাই। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ভাল ভাবে গোসল করে পবিত্র পরিস্কার বস্ত্র পরিধান করে বিবি আসমাকে নির্দেশ দিলেন যে হে বোন আসমা আপনি আমার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মধ্যে কার্পূর জ্বালিয়ে দিন। তারপরে নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) তার হুজরাস্থিত শয্যায় শয়ন করে বিবি আসমাকে ডেকে বললেন আপনারা সকলেই বের হয়ে যান এবং বাহির হতে হুজরার দরজা বন্ধ করে দিন। সত্যি নবী দুলালী হযরত ফাতেমার জীবনের শেষকথা ও নির্দেশ মুতাবেক বিবি উম্মে সালমা এবং উপস্থিত অন্যান্য রমণীগণ বের হয়ে বাহির হতে দরজা বন্ধ করে দিলেন! সত্যি নারী জগতের উজ্জল নক্ষত্র হযরত ফাতেমার (রাঃ) জীবনের শেষ অবস্থা দেখে ন হতে ছিল তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে সেজে ওজে মনের খুশীতে অধীর আগ্রহ নিয়ে বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রস্থান করতেছেন এবং রহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার এই বিশেষ দাওয়াতে তিনি নিজে এমনিভাবে সাড়া দিয়ে নিজেকে তৈয়ার করেছেন। এমনিভাবে আর কোন দিনই তার জীবনে এভাবে দেখা যায়নি।

আল্লাহ তায়ালার প্রিয়জনরা তার সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে মায়াময় পৃথিবী ত্যাগ করে কি ভাবে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয় তার জলন্ত প্রমাণ হল বিবি ফাতেমা। বিবি ফাতেমা (রাঃ) পাক পবিত্র হয়ে শ্বেত ধবল বস্ত্রচ্ছাদিত হয়ে নির্জন কক্ষে শায়িত হয়ে কোন সময় সে তার প্রাণপাখি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছে তা কেহ বলতে পারেনি তবে আশেক মাশুকের মিলনের শুভ মুহূর্তেও নবী কন্যা হযরত পাতেমা (রাঃ) গোনাগার উম্মতদের কে ভুলে যাননি বরং বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তেও রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করে বলেছেন– হে আমার প্রভু জীবনের শেষ মুহূর্তে আমার আকুল ফরিয়াদ আমার পিতা হযরত রাসূল (সাঃ)-এর গোনাগার উম্মতদেরকে ক্ষমা করে দিন।

এক বর্ণনায় বিবি আসমা বলেন আমি যখন হুজরা বন্ধ করে বের হয়ে হুজরার দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলাম। তখন আমি হুজরার মধ্যে হতে করুন কণ্ঠে শুনতে পেলাম। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রাণপাখি বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে মুহূর্তেও আমার প্রার্থনা হল। হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার পিতা হযরত রাসূল (সাঃ)-এর গোনাহ্গার উম্মতদেরকে ক্ষমা করে দিন। এমনি ধরনের হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনার কিছু সময়ের পরেই দেখলাম হুজরা একেবারে নিস্তব্ধ কোন সাড়া শব্দ নেই। তখন আমার মন যে কেমন লেগেছিল যার কারণে আমি হুজরা খুললাম। আমি হুজরার দরজা খুলে দেখতে পেলাম নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) আমাদের ছেড়ে চির জীবনের জন্যে চয়ে গিয়েছে। এহেন মুহূর্তে বিদ্যুৎ বেগে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) আর দুনিয়ায় নেই। উপস্থিত সকলেই কান্নায় লুটিয়ে পড়লাম। এদিকে ইমাম হাসান হুসাইন নানা জানের রওযা মোবারক হতে গৃহে ফিরেছেন। বিবি আসমা আদরের সন্তানদেকে চির জীবনের তরে মায়ের পবিত্র মুখখানি উম্মোচন করে দেখালেন। মা ফাতেমা আদরের দুলাল ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) তাদের মায়ের প[illegible] চেহারাখানি দেখে মনের অজান্তে কেঁদে দিলেন। যে কাঁদা দেখে উপ[illegible] কেহই স্থির থাকতে পারলেন না। আর স্থির থাকার কতাও না যেহেতু তার মাতা তাদেরকে জীবনের শেষ বারের মত গোসল করায়ে নানাজীর রওযা মুবারকে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে তারা মনের খুশীতে নানা জানের রওযা মুবারকে যিরত করে গৃহে ফিরলেন। গৃহে ফিরে মধু মাখা "মা" শব্দটি বলে ডাক দিলেন কিন্তু প্রতি দিনের মত আজ আর বাবা হাসান হুসাইন মায়ের শব্দ আসলনা। বরং শুনতে পেল তাদের মা তাদেরকে ছেড়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে।

যাইহোক নাবী জামাতা হযরত আলী (রাঃ) নিজে শোকের সাগরে নিমজ্জিত হয়েও আদরের সন্তানদেরকে আবেগ জড়ানো কণ্ঠে শান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু তারা তাদের 'মা' শব্দের করুন কণ্ঠের চিৎকার উপস্থিত সকলকে এমনি ভাবে ব্যথাতুর করে তুললেন যা লিখনির মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব না। নবী কন্যা হযরত মা ফাতেমার (রাঃ) পূর্বের অসীয়ত অনুযায়ী তাকে তড়িৎ গতিতে দাফন করা হল।

এক বর্ণনা থেকে জানা যায় নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মৃত্যুর

পরে তাকে গোসল করাবার সময় উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) গৃহে মধ্যে তার কাছে যাওয়ার জন্যে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাকে বিবি আসমা ভেতরে যেতে বিশেষভাবে নিষেধ করলেন। তখনই তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট আসমা সম্পর্কে অভিযোগ তুললেন। অভিযোগ করার সাথে সাথে তিনি ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে বাহির হতে ডেকে স্বীয় পত্নিকে বললেন তুমি নবীজির কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) গোসল দিতে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) কে পর্যন্ত নিষেধ করতেছ! এর কারণ কি? গৃহের মধ্যে হতে আসমা পূর্বের অসীয়তমূলক কথাগুলো শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) কোন কিছু না বলেই এখান থেকে চলে গেলেন।

কোন এক বর্ণনায় এভাবেই দেখা যায় যে নারী জগতের উজ্জল নক্ষত্র রাসূলুল্লাহর কলিজার টুকরা বিবি ফাতেমা (রাঃ) ইহধাম ত্যাগের সংবাদ চারদিকে পৌঁছানোর পূর্বেই রাতের আঁধারেই তার দাফন কার্য শেষ হয়েছিল। এমনকি নবী কন্যা হযরত ফাতেমার ইহধাম ত্যাগের সংবাদ এ মর্ত হযরত ওমর (রাঃ) কে জানানো হলনা। দাফন কাফনের পরে পরের দিন সকালে হযরত (রাঃ) সহ কতিপয় সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে আবেগ জড়ানো এ বিষয়ে অভিযোগ তুললেন। তাদের এহেন অভিযোগ শুনে হযরত আলী (রাঃ) মন খারাপ হলেও তিনি হযরত ফাতেমার ইহধাম ত্যাগের পূর্বের অসীয়ত মূলক কথাগুলো শুনালেন। হযরত আলীর কথা শুনে হযরত ওমরসহ সাহাবীরা কিছুই বললেন না বরং তারা নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর জন্যে প্রাণভরে দোয়া করলেন।

সমাপ্ত